ষষ্ঠ অধ্যায়

সমকালের প্রেক্ষাপটে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর স্বাতন্ত্র্য

> *"গল্প-উপন্যাসে এমনই এক শিল্পকর্ম, যা রচনা হয়তো-বা সহজতর, তেমন সহজ বা সরল শিল্পীর কাছে, কিন্তু তার নির্মাণতত্ত্ব বা পরিণতি নিয়ে কথা বলা এক ভুলভুলাইয়ায় পথ খোঁজার মত— সেখানে সব পথই খোলা, অথচ সব পথই বন্ধ, অথচ কোনো পথই শেষ নয়, কারণ সব পথ থেকেই একাধিক বিকল্প পথান্তর আছে।"*[১]

সাহিত্য সৃজন সৃষ্টিকর্তার হাতে অভূতপূর্ব অবয়ব ধারণ করে তাঁর অনুভব শক্তির গুণে। সাহিত্য সৃষ্টির নবতর রূপ বলতে— সাহিত্যিক সমাজ জীবনের নতুন বিষয়বস্তুকে যে ভাবনায়, যে আঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলেন তাকে বোঝায়। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের পাতায় নবতর রূপের উদ্ভব হয়েছে বহু সৃজনশীল সাহিত্যিকের হাতে। বাঁক বদল হয়েছে স্থান-কাল-বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে পদার্পণ করেন। একুশ শতকের তৃতীয়ার্ধের সূচনা পর্ব পর্যন্ত তাঁর লেখনী ক্ষান্ত হয়নি। অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত তিনি লেখালেখির সঙ্গে প্রানবন্তভাবেই জড়িত। প্রতিনিয়ত সমাজ জীবন থেকে রসদ সংগ্রহ করে তিনি তাঁর লেখনীকে শাণিত করে চলেছেন। বিচিত্র স্বাদের উপন্যাস তিনি দীর্ঘ তিনটি দশক ধরে আমাদের উপহার দিয়েছেন। প্রতিটি উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনে তিনি যেমন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি কাহিনির প্লট নির্মাণেও তিনি নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। জীবনকে তিনি এযাবৎকাল পর্যন্ত যেভাবে উপলব্ধি করেছেন তার চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন উপন্যাসগুলির মধ্যে। বিশ শতকের শেষ পাদে স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাস রচনায় এলেন। তিনি বহন করে নিয়ে এলেন ষাট-সত্তর-আশির দশককে। উপন্যাসে সময় বদলের চিত্র তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসে যেমন এসেছে। তেমনি উঠে এসেছে শূন্য দশক থেকে মানুষের রূপ বদলের চিত্রও। তাঁর প্রথম উপন্যাস থেকে তিনি তাঁর জাত চিনিয়ে দিলেন। প্রথম উপন্যাসে নব্বই দশকের চিত্র উঠে না এলেও তিনি যে বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করলেন সে বিষয়টি বাংলা সাহিত্যে অভিনব।

বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে পশ্চিমবাংলার রূপ পরিবর্তন ঘটেছে বহু ক্ষেত্রে। নগর এবং গ্রামের মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য ছিল সে পার্থক্য ধীরে ধীরে কিছুটা কমতে শুরু করেছিল। এর কারণ বিশ্বায়ন নামের সর্বগ্রাসী রূপ। যা পৃথিবীর প্রতিটি স্তরে নিজের থাবা বসাতে শুরু করে।

ফলে বনেদি কলকাতার রূপ আর সেভাবে কলকাতাকে চিহ্নিত করে না। কলকাতার বৃদ্ধি পূর্ব ও দক্ষিণদিকে হতে শুরু করেছিল। নতুন টেকনলজির দাপট মানুষের মধ্যে বিলাস-ব্যসনের চাহিদা বৃদ্ধি করতে শুরু করেছিল। শহর কলকাতার পসার বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় চিহ্ন সল্টলেক সিটি গড়ে ওঠা। শহরের জীবন-যাপনে গাড়ি, ফ্যান, ফ্রীজ, কুলার, স্কুটার, ভিসিডি, কালার টিভি, ইলেক্ট্রনিক মেশিন ইত্যাদির রমরমা বেড়ে গিয়েছিল। শহরের ছোঁয়া গ্রামগুলিকে রেহাই দেয়নি। সামান্য সঞ্চয়ে গ্রাম্য মানুষগুলিও বিলাস-ব্যসনের চিহ্ন বহন করতে সচেষ্ট হয়। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক-সামাজিক-আর্থিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন নিজের পরিধি বৃদ্ধি করতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় পুরনো সংস্কার ভেঙে ফেলার চেষ্টা। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিরোধী দলের উত্থান। বাবরি মসজিদকে ধ্বংসের প্রেক্ষাপটে তৈরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের ইতিহাস। বিশ্ব জুড়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েভের প্রসার, প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি মানুষের জীবন যাত্রাকে বহুমুখী করে তুলেছিল। শুধু বাংলার প্রেক্ষাপটে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটেও ঘটে চলেছিল একের পর এক অভিঘাত। সোভিয়েত রাশিয়ার পতন বিশ্ব-রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট আদর্শও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এই সময়। সময় বদল এবং মানব জীবনের বিচিত্র রূপ-বদল স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাসে উঠে এলো নতুন রূপে। আর একুশ শতকের দুটো দশক বিশ্বায়নের রূপ বদলের চিত্র বহন করতে শুরু করল নানাভাবে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস সে চিত্রকেই নব রূপে ধারণ করল আমাদের সামনে।

১

কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী গল্পলেখার পরিসরে পদার্পণ করেছিলেন সত্তরের দশকের শেষ পাদে। দীর্ঘদিনের গল্পচর্চার মধ্যে উপন্যাস লেখার তাগিদ তিনি অনুভব করেন। ১৯৯২ খ্রি: প্রথম উপন্যাস লেখার তাগিদ মূলত পত্রিকার দৌলতে। তবে দীর্ঘসময় ধরে নিজেকে তিনি তৈরি করেছেন যা 'চতুষ্পাঠী' (১৯৯৫খ্রি: গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) উপন্যাসের মধ্যে পাঠক অনুভব করল। বাংলা সাহিত্যে এক নতুন স্বাদের উপন্যাস উঠে এল। প্লট নির্মাণে স্বপ্নময় চক্রবর্তী সময়ের গুরুত্বকে উপলব্ধি করলেন। 'চতুষ্পাষ্ঠী' উপন্যাসে উঠে এলো সংস্কৃত ভাষাপ্রেমী অনঙ্গমোহন চক্রবর্তীর কথা। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে যে ভাষার অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ সে ভাষা ধীরে ধীরে ব্রাত্য হওয়ার পথে। একাডেমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা চর্চা সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এর পিছনে রাজনৈতিক কারণ বহুল পরিমাণে দায়ী। অনঙ্গমোহনবাবু বুঝেছিলেন সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব। তিনি অনুভব

করেছিলেন সমস্ত বিষয়ের উৎস সংস্কৃত ভাষার মধ্যে রয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে 'চতুষ্পাঠী'-র শিক্ষা অচল হতে বসেছিল একটা সময়ে। অনঙ্গমোহনবাবু 'চতুষ্পাঠী'র শিক্ষাব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে ও সংস্কৃত ভাষাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। পরিবারের অন্ন সংস্থানের ভার তাঁর ওপর এলে তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করতে অপারগ হয়েছেন। কিন্তু জীবন ধারণের তাগিদ মানুষকে কত নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করায় তা অনঙ্গমোহনবাবুর জীবন পরিক্রমা বুঝিয়ে দেয়। অনঙ্গমোহনবাবু হয়েছিলেন নতুন ভাবনার সম্মুখীন। তাঁকেও বেছে নিতে হয়েছে অন্য পেশার অবলম্বন। জীবনের চলমানতা মানুষকে কীভাবে অন্য ভাবনায় ভাবিত করে তোলে তার প্রমাণ 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাস। নব্বইয়ের দশকে পুনরায় মৃয়মান সংস্কৃত ভাষাকে চর্চায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রেক্ষাপটেই অনঙ্গমোহনের চরিত্র এবং তার আনুষঙ্গিক অন্যান্য চরিত্র নির্মাণ বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস জগতে মাইলস্টোন স্বরূপ।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর দ্বিতীয় উপন্যাস 'নবমপর্ব' (১৯৯৭খ্রি:)। উপন্যাসের পটভূমি ওড়িষ্যার প্রত্যন্ত অঞ্চল কেওনঝড়-এলাকার অধিবাসীদের জীবন-চর্চার চিত্র। কল্যাণ চক্রবর্তী রেললাইনের কাজের সূত্রে কেওনঝড়ে উপস্থিত হয়ে দেখে সংস্কৃতি পরিবর্তনের রূপ। সুদূর কলকাতার পরিবর্তনের ছোঁয়া ওড়িষ্যার এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোনো প্রভাব ফেলেনি। মাটির কাছের মানুষেরা তাদের নিজস্ব রীতিতে জীবন যাপন করতে ব্যস্ত। উপন্যাসটির মধ্যে শোষক শ্রেণির চরিত্রগুলিকে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। কর্মজীবনের সূত্রে তিনি একসময় ওড়িষ্যায় ছিলেন। ফলে সে সময়ে তার সংগৃহীত কিছু তথ্য যে 'নবমপর্ব' উপন্যাসে উঠে এসেছে তা অনুমান করা যায়। আসলে এই উপন্যাসে পরিবেশিত বিষয় বিন্যাস অনেকটা ক্ষেত্রসমীক্ষার ফল। গল্প রচনার মধ্যে পূর্বেই তিনি নিজের জাত বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। উপন্যাস রচনায় তিনি সে জাতকে আরও বলিষ্ঠ রূপ দিলেন। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী অন্ত্যজ জীবনকে নিয়ে এই উপন্যাসে কথা বলতে বসেননি। কিন্তু অন্ত্যজ মানুষেরা বারবার কীভাবে শোষিত হয় তার রূপকে তুলে ধরেছেন। নব্বইয়ের দশকে টেলিভিশনের ব্যক্তিগত মালিকানার পর্ব শুরু হয়েছিল। ফলে 'মিডিয়া' সাধারণ মানুষের জীবনে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল তার সামান্য নিদর্শন 'নবম পর্ব' উপন্যাসের নামকরণের তাৎপর্যের মধ্যে নিহিত। দূরদর্শনের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান 'উয়োমেন অফ ইন্ডিয়া'-এর নবম পর্বে ইলিশি জুয়াঙ্গোর জীবন কাহিনি, তার এ্যাথলেট্স হওয়ার পারম্পর্য নিয়ে একটি ডকুমেন্টেশান দেখানো হবে। তথ্য সংগ্রহের পন্থায় কোথায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আঘাত প্রাপ্ত হয় সেই ইতিহাস এ উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য। কল্যাণ চক্রবর্তীর মতো মানুষেরা সমাজের

অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর শ্রেণি পার্থক্যকে বুঝতে পারে। তারা চায় ইলিশির মতো মেয়েকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে। কিন্তু জীবন তো অনিশ্চয়তার নামান্তর। যার দরুণ কল্যাণের মৃত্যু এবং ইলিশির জীবন গড্ডালিকা প্রবাহের হাতে পড়ে যাওয়া। এটি আসলে মানুষের জীবন বৈচিত্র্যকেই তুলে ধরে। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী 'নবম পর্ব' উপন্যাসটিতে তথ্য পরিবেশনের চাপে চরিত্রের বিকাশকে সেভাবে উপস্থাপিত করতে পারেননি। কিন্তু পশ্চিমবাংলার বাইরে ওড়িষ্যার জীবন-যাত্রা, সেখানকার ভুঁইয়া আন্দোলন, সাহিত্যচর্চার প্রেক্ষাপট, ওড়িয়াদের চোখে বাঙালি জাতির অবস্থান, অন্ধবিশ্বাস- সংস্কারকে যে ভাবে তুলে ধরেছেন তাতে এ উপন্যাস সাহিত্যের পাতায় আলাদা মাত্রা যোগ করে।

'বাস্তুকথা' (১৯৯৯ খ্রি:) উপন্যাসে উদ্বাস্তু মানুষগুলোর একটুকরো বাস্তু খোঁজার প্রেক্ষিতে মানসিক দ্বন্দ্বের চিত্র উঠে এসেছে। আপাতভাবে শশাঙ্কমোহনবাবুর বাস্তু সন্ধানের কাহিনি দিয়ে উপন্যাসের মূল কাহিনি বিস্তার লাভ করলেও আসলে শশাঙ্কমোহনের পুত্রবধূ বনানীর বাস্তুহারা হওয়ার কাহিনিই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসার পর স্কুলের হেডমাস্টার শশাঙ্কবাবু এদেশের চাকরির বন্দোবস্ত করেন। কলোনি জীবনের পাঠ চুকিয়ে দিয়ে মফঃস্বল এলাকায় একটি জায়গা কিনে নিয়েছিলেন। বেশ বড় জায়গা কিনে দেশের বাড়ির আদলে নিজের বাস্তু-সংস্থান করেন। কিন্তু জমির ফটকা দালালির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় সে বাস্তু থেকে উচ্ছেদ হওয়ার উপক্রম হন। ছেলে বিতানের সহায়তায় তিনি বাস্তু থেকে উচ্ছেদ হতে গিয়েও রক্ষা পান। উপন্যাসের কাহিনির দ্যোতনা শুরু হয় একই সঙ্গে বর্ণিত বনানীর কাহিনি ধারায়। উচ্চ শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান স্বামী বিতানের পাশে বনানী নিজের অবস্থান নিয়ে আশঙ্কাগ্রস্ত বিয়ের প্রথম থেকেই। বিতানের প্রেমিকা রুবির উপস্থিতি কীভাবে বনানীকে বিতানের মনোভূমি থেকে উচ্ছেদ করবে সে কাহিনিই উপন্যাসের টার্নিং পয়েন্ট। বাস্তুভূমি থেকে উচ্ছেদ হলে পুনরায় তার সংস্থান হতে পারে। কিন্তু মনোভূমি স্বামী-স্ত্রীর প্রধান বাস্তু। তা নির্ভর করে বিশ্বাস এবং ভালোবাসার ওপর। বনানী সে জায়গা থেকে উচ্ছেদ হল রুবির জন্য। আসলে এই আখ্যানে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার বিভিন্ন ধরনের চিত্র এঁকেছেন। বাস্তুকথা আসলে মূলভূমিকে কেন্দ্র করে। মূলভূমির পার্থক্য কতরকম হতে পারে সে চিত্র উপন্যাসটির স্বাতন্ত্রকে প্রকাশ করে।

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম পর্বের উপন্যাসের সময়কালে বিশ শতকের শেষ পাদকে চিহ্নিত করে গবেষণা কর্মটিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। নব্বইয়ের দশকে প্রকাশিত কিছু মাইলস্টোন জাতীয় উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের গতিপথকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রথমেই বলতে হয়

কিন্নর রায়ের 'প্রকৃতি পাঠ' (১৯৯০খ্রি:) উপন্যাসের কথা। 'ইকোক্রিটিসিজম' বিষয়কে কেন্দ্র করে উপন্যাস সৃষ্টি এই প্রথম। যা বাংলা উপন্যাসের জগতে মাইলফলক। এই দশকে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। দু'টিই ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। 'নবম পর্ব' উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবনের কথা উঠে এসেছে। ভগীরথ মিশ্র অন্ত্যজ জীবন নিয়ে লেখালেখি শুরু করেছেন বহু আগে থেকেই। তবে নব্বইয়ের দশকে প্রকাশিত 'তস্কর' (১৯৯২খ্রি:), 'আড়কাঠি' (১৯৯৩ খ্রি:), 'চারণভূমি' (১৯৯৪ খ্রি:), 'জানগুরু' (১৯৯৫ খ্রি:) বা 'মৃগয়া' (১৯৯৬খ্রি: -২০০০ খ্রি:) পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত উপন্যাসগুলিতে তিনি যে ভাবে নিজের জাতকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন, সেভাবে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী 'নবম পর্ব' উপন্যাসকে সাজিয়ে তুলতে পারেননি। তবে অন্ত্যজ জীবনের আরও গভীরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল উপন্যাসটির মধ্যে। 'বাস্তুকথা' উপন্যাসের মধ্যে ছিন্নমূল মানুষগুলির যাপিত জীবনের চিত্র তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। তবে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে উদ্বাস্তু মানুষগুলোর জীবনযাত্রাকে, তাদের মানসিক টানাপোড়েনকে ধরতে চেয়েছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী সেভাবে জীবনকে ধরেননি। তিনি 'বাস্তুকথা' উপন্যাসে বাস্তুভূমির এবং মনোভূমির সংকটকে এক ছত্রছায়ায় আনার চেষ্টা করেছেন।

নব্বইয়ের দশক থেকেই শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক আদর্শের অবক্ষয়। প্রযুক্তির উন্নয়নে মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়। গ্রামগুলির রূপ পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল এই সময়পর্বে ব্যাপকভাবে। ফলে কথাসাহিত্যে স্থান পেতে শুরু করে সময় বদলের চিত্র। সমাজ চেতনার বিবৃতি এবং অন্ত্যজ মানুষের জীবন যাত্রাও লেখকদের কলমকে প্রেরণা যোগাতে শুরু করে। এই সময়পর্বে যে ঔপন্যাসিকেরা বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন তারা সত্তর-আশির দশক থেকেই তাদের জাত চিনিয়ে দিয়েছিলেন। ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাস যেমন একটি ধারাকে চিহ্নিত করেছিল তেমনি নবারুণ ভট্টাচার্যের কলমে 'হারবার্ট' (১৯৯৩ খ্রি:)-এর মতো উপন্যাস লেখা হল। নির্মিত হল অস্তিত্বের সংকটের চালচিত্র। সৈকত রক্ষিত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখকদের বাংলা উপন্যাসে উঠে এল সমাজ, পরিবেশ, সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা। নলিনী বেরা, প্রফুল্ল রায়, সৈকত রক্ষিত, অমলেন্দু চক্রবর্তী, কিন্নর রায়ের হাতে বাংলা উপন্যাসের পালাবদল চিহ্নিত হয়। নারী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মল্লিকা সেনগুপ্তের 'সীতায়ন' (১৯৯৬ খ্রি:) অন্যমাত্রায় সীতা চরিত্রের রূপকে তুলে ধরেছেন। সুচিত্রা ভট্টাচার্য নব্বইয়ে শক্তিশালী লেখিকা। তাঁর 'দহন' (১৯৯৪ খ্রি:) উপন্যাসের মধ্যেই তিনি নিজের জাতকে চিনিয়ে দিয়েছেন। বাণী বসুর 'গান্ধর্বী'

(১৯৯৩ খ্রি:), 'মৈত্রেয়জাতক' (১৯৯৬ খ্রি:) একদম অন্যস্বাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ। একের পর এক উপন্যাসে সমকালের চিত্রের সঙ্গে ষাট-সত্তর-আশির দশকের চিত্রও উঠে এসেছে সমানতালে। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর নির্মিত 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাস যে মন্ত্র নিয়ে পাঠকের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছে 'নবম পর্ব' বা 'বাস্তুকথা' সে জায়গা পাওয়ার কথা নয়। তবে বিষয়বস্তু নির্বাচনে তিনি যে সব সময় ব্যক্তিচরিত্রের অভীপ্সাকে খুঁজে চলেন তার প্রমাণ উক্ত উপন্যাসগুলিতে রয়েছে। ফলে প্রথম পর্বে উপন্যাসের মধ্যে জীবন জিজ্ঞাসার সীমিত দিকের উন্মেষপর্বকে আমরা দেখতে পাই। তবে বিশ্বায়নের সূচনা পর্বের পরিবর্তনের চিত্র উপন্যাসের ঘটনা সংস্থানে দেখা যায়।

২

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসের সময়কে ২০০০-২০০৯ সাল পর্যন্ত সময়ের মাপকাঠিতে বিভক্ত করেছি। এই সময়পর্বে 'কম্পিউটার গেম্‌স' (২০০২ খ্রি:), 'চলো দুবাই' (২০০২ খ্রি:), 'অবন্তীনগর' (২০০২ খ্রি:), 'যে জীবন ফড়িংয়ের' (২০০৪ খ্রি:) উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। শূন্য দশকে সামাজিক পরিমণ্ডলে যে পরিবর্তনগুলো সাধিত হয়েছিল তার রূপকে একটু বর্ণনা করে নেওয়া যাক। এই যুগ বিশ্বায়নের যুগ। আন্তর্জালিক মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এক ছত্রছায়ায় আসতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন সম্পূর্ণ দশক জুড়ে ছায়া ফেলেছে। সাধারণ মানুষ যারা রাজনীতির বাইরে থাকতে পছন্দ করত তারা রাজনীতির জটিল আবর্তে জড়িয়ে পড়তে থাকে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবন-যাত্রারও পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এই পর্বের মধ্যে। শহুরে মানুষগুলি ফ্ল্যাট-জীবনে নিজের গণ্ডিকে সীমাবদ্ধ করতে চাইছে। আর গ্রাম্য মানুষগুলি শহুরে আদব কায়দায় নিজেদের সাজিয়ে নিতে চাইছে। ইন্টারনেট এবং কম্পিউটার হাতের নাগালে চলে আসায় নবপ্রজন্ম সে দিকেই আগ্রহ প্রকাশ করে। দাম্পত্য সম্পর্কের ভীত দিন দিন আলগা হতে শুরু করে। নৈতিক অবমূল্যায়নের চরমতম প্রকাশ দেখা যায় এই সময়পর্বে। বিনোদন মাধ্যম সব প্রজন্মকে প্রলুব্ধ করায় তারা যে কোনো মূল্যে বিলাসিতায় মসগুল থাকতে চাইছে। অনু-পরমাণুর খেলায় বিশ্ব নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে পা বাড়িয়ে আতঙ্কবাদী হামলা ঘটেছে ভারত সহ বিশ্বের বহু দেশে। বড় প্রমাণ ২০০১ সালের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে লাদেন বাহিনীর হামলা। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের উত্থানের পরিচয় বিশ্বব্যাপী। সব মিলিয়ে সমাজের গতিপথ ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। যা সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের নামান্তর। অর্থাৎ এসময় ভোগবাদী মানসিকতা প্রসারের সময়।

একুশ শতকের প্রথম দশকে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস রচনার পটভূমিতে উঠে এসেছেন ভিন্ন পটভূমিকে কেন্দ্র করে। এই সময় সাধন চট্টোপাধ্যায়, কিন্নর রায়, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, অনিল ঘড়াই, অমর মিত্র বিশিষ্ট মহিমায় অবতীর্ণ। নারী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁরা বিশ শতক থেকেই লেখায় উঠে এসেছেন তাঁদের মধ্যে সুচিত্রা ভট্টাচার্য, বাণী বসুর নাম উল্লেখ করা যায়। কারণ নব্বইয়ের দশকে তিনি নিজের জাত চিনিয়ে দেওয়ার পর একুশ শতকের শুরুতেই 'অষ্টম গর্ভ' (২০০০ খ্রি:) উপন্যাসে আবার চমক দিলেন। তিলোত্তমা মজুমদারের 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' (২০০৩ খ্রি:) উপন্যাসে তিনি লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়ের আকুতিকে রূপ দিলেন। 'শামুকখোল' (২০০৫ খ্রি:) উপন্যাসেও তিনি নারীভাবনার বশবর্তী লেখিকা। মন্দাক্রান্ত সেন, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অনিতা অগ্নিহোত্রীর মতো লেখিকারাও সদর্পে এই সময়পর্বে উপন্যাস রচনা করেছেন। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী একুশ শতকের প্রথম সময় পর্বে যে উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে যুগমানসিকতা উঠে এসেছে প্রবল মাত্রায়। 'কম্পিউটার গেম্‌স' উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে মানুষ যন্ত্রের দাসে পরিণত হয়। কম্পিউটার যেমন ছোট স্ক্রিনের মধ্যে খেলুড়েকে আটকে রাখে, তেমনি একুশ শতকের জীবন-সংস্কৃতিও এভাবেই মানুষকে আটকে রাখে তার ফ্ল্যাটের মধ্যে। যেখানে সম্পর্কের ভীত দিন দিন নড়বড়ে হতে থাকে। দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্বাস, ভরসা বর্তমান প্রজন্মে প্রহসনে পরিণত হয়েছে। যে চিত্রটি এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। যার জন্য ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় প্রোটন, পুকাইদের মতো সন্তানদের। আসলে যৌন চাহিদাকে দমন করতে না পারলে সংসার জীবনে যে কোনো সময় বিপথগামিতা ঘটতে পারে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের ক্ষেত্রেই। মানিক, মল্লিকার জীবনবোধের ভ্রান্ত ধারণা তাদের সংসার জীবনকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়। তবে মানিক ছেলেকে কম্পিউটারের প্রলোভনে সত্যকে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে। অন্যদিকে প্রবাল মল্লিকার পরকীয়া সম্পর্কের সত্য জেনে তার সঙ্গে থাকতে নারাজ। যার ফল পুকাইয়ের আত্মহত্যা। আসলে পিতা-মাতা যদি নিজেদের চাহিদাকে নিবৃত্তি করতে না পারে তবে তার ফল নেতিবাচকই হবে। আসলে পিতা-মাতার নৈতিক অবক্ষয় একুশ শতকের যুব-মানসিকতার নির্দেশক। যার ফলে সন্তানদের ভবিষ্যৎ কোন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় তার ইঙ্গিত উপন্যাসে রয়েছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী সমকালের উপন্যাসদেহ নির্মাণ থেকে নিজের পরিচয় চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

'চলো দুবাই' উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় নবীন প্রজন্মের চাহিদার বিকৃত রূপকে যা ভোগবাদী মানসিকতা পুষ্ট। মলয় নবীন প্রজন্মের মেরুদণ্ডহীন, মূল্যবোধহীন, নীতিহীন মানসিকতার ধারক। বাচ্চু বিলাসিতার পাখায় ভর করে দুবাইয়ের মত শহরে বিলাস ব্যসনে দিন যাপনের কথা ভাবে

এবং মলয়কেও সে ভাবনায় ভাবিত করে। মোবাইল, স্কুটার এ-প্রজন্মের সন্তানদের প্রধান আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। নীলকণ্ঠবাবুর মতো পিতারা তাই দিশেহারা হয়ে যান। সিনেমার মতো মেয়েরা মোহময়ী হতে চায়। ভোগবাদী জীবনের মোহ এসময়ের বুকে আঁচড় বসিয়েছিল। তারই নৃশংস এবং করুণ রূপ পরিস্ফুট হয় সিনেমার মতো মেয়ের মৃত্যু দৃশ্যে। বাংলা উপন্যাসের জগতে বিষয়বস্তু নির্বাচন ও প্লটের সংস্থানে 'চলো দুবাই' উপন্যাস অন্য ঘরানায় স্থানের যোগ্য। আসলে জীবন জিজ্ঞাসার ভিন্নস্বর অনুসন্ধান করেছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। 'চলো দুবাই' উপন্যাসে জিজ্ঞাসায় আমাদের সামনে উঠে আসে একুশ শতকের নতুন প্রজন্মের ভোগবাদী মানসিকতার চিত্র। বিশ্বায়নের প্রভাব কীভাবে চরিত্রের রূপ পরিবর্তন করে তার চিত্র এই উপন্যাসে উঠে এসেছে।

'অবন্তীনগর' উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের জগতে মাইলফলক। উপন্যাসটি বঙ্কিম পুরস্কারে ভূষিত হয় ২০০৫ সালে। উপন্যাসটিতে একটি সুবর্ণ বণিক পরিবারের একশ বছরের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাস দেহে স্থান পেয়েছে বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের চিত্র। বনেদি পরিবারের সন্তানেরা কীভাবে তাদের পূর্ব ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে অক্ষম তা এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। সত্যচাঁদ এবং তার সন্তানেরা এই আত্মজিজ্ঞাসায় উপনীত হয়েছে যে তারা পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মকে কী জবাব দেবে। ঐতিহ্যের অবক্ষয়ের পিছনের কারণকে কীভাবে সামনে নিয়ে আসবে? কারণ নৈতিকতার বদল ঘটেছে সত্যচাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের। আত্মকেন্দ্রিকতা তৈরি হয়েছে সত্যচাঁদের সন্তানদের মধ্যে। সে চিত্র তিনি মৃত্যুর পূর্বে দেখেগিয়েছেন। সত্যচাঁদ, সত্যচাঁদের সন্তান এবং পুত্রবধূর আত্মকথায় উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটলেও আসলে তারা প্রত্যেকে আত্ম-অনুসন্ধানে রত। তারা তাদের অস্তিত্বের সংকটকে লক্ষ করেছিল যা এ সময়ের পরিচয়বাহী। উপন্যাসটিতে আত্মকথন রীতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। ফলে সমকালের প্রেক্ষিতে 'অবন্তীনগর' ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর অনবদ্য সৃষ্টি। 'যে জীবন ফড়িংয়ের' উপন্যাসে অশোকের মধ্য দিয়ে মানুষের রক্তের ভিতরে আরও এক মানুষের বসবাসের চিত্র উঠে এসেছে। সেই মানুষকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। আসলে বয়সবৃদ্ধি মানবজীবনের বহু চলমান ধারায় ভাটার সৃষ্টি করে। কিন্তু মনের গোপন কোণে জোয়ার যেন লুকিয়ে থাকে। শুধু সময় এবং পরিস্থিতির অনুকূলে তার উত্থান হয়। এমনই ঘটনা আশোক ও মালার জীবনে ঘটেছে। মালার এবং অশোকের পড়ন্ত জীবনে তারা আবার সন্তান ধারণের পর্যায়ে উপনীত হয়। একটি উত্তেজক ঘটনা কীভাবে অশোকের যৌন জীবনের পরিবর্তন ঘটালো সেটাই লক্ষণীয়। আসলে মানব জীবনের বহু জটিল বিষয়ও অনেক সময় সহজ হিসেবে উপস্থিত হয়। অশোকের মধ্যেও সে ভাবনার প্রসার

ঘটে। সে বিশ্বাস করে মানবজীবনের চলমানতা থেমে থাকে না। তার আবর্তন ঘটে সময়ের প্রেক্ষিতে, প্রয়োজনের তাগিদে। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী অশোকের মতো মানুষদের বেছে নিয়েছেন যাদের নিয়ে উপন্যাসের সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ, তারা নিতান্ত সাদামাটা চরিত্র। জীবনে বৈচিত্র্যের কোনো আভাস নেই তাদের। ফড়িংয়ের মতো ফ্যান্টাসীর জগতে তাদের বিচরণ। কিন্তু এহেন সাধারণ জীবনে হঠাৎ পট পরিবর্তন হতে পারে। বিড়ম্বনার সৃষ্টি হতে পারে। আবার সেখান থেকে বেরোনোর পথও সন্ধান করতে পারে। এমন চরিত্র নিয়ে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাস রচনা করেছেন যা সমকালের মাইলস্টোন সৃষ্টিকারী উপন্যাস থেকে আলাদা। আর বিষয় বা চরিত্র নির্মাণে স্বপ্নময় চক্রবর্তী বারবার ভিন্নমাত্রা যোগ করেছেন। মানব চরিত্রের বিচিত্র ভাবনা, তাদের বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাসকে স্বাতন্ত্র্যের দরজায় পৌঁছে দেয়। দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস রচনাও সে সূত্র বাদ যায়নি। চরিত্রের মধ্য দিয়ে সময়কে ধরতে চাওয়ার প্রয়াস এ পর্বের উপন্যাসের মধ্যেও দেখা যায়।

৩

একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত উপন্যাসগুলিকে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর তৃতীয় পর্বের উপন্যাসের মধ্যে ফেলে ভাগ করে নিয়েছি। এখানে ২০১০-২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়কালকে বেছে নিয়েছি। এই দশকের শুরু থেকে সমগ্র ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার হাত বদল হয়। পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠিত হয়। এসময় সমগ্র বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বিনোদন মাধ্যমের রমরমা দেখা যায়। অর্থ সংস্থানের জন্য বিদেশে পাড়ি দেওয়ার প্রবণতা একুশ শতকের প্রথম দশক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বিতীয় দশকে এসে তা মাত্রাধিক্যে গিয়ে পৌঁছায়। নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার অর্থাৎ ধর্ষণের ঘটনার বৃদ্ধি ঘটে। ২০১৪ সালে ভারত সরকার নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সমগ্র দেশজুড়ে পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। মোবাইল ফোনের ফিচার পরিবর্তিত হয়ে অ্যানড্রয়েড ফোন বিশ্বের দরবারে থাবা বসায়। তৈরি হয় সমাজ মাধ্যমের (social media) নতুনতর রূপ। বিশ্বসহ ভারতও মহাকাশ গবেষণায় নতুন পথের আবিষ্কারক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরে।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার প্রবর্তিত 'সবুজসাথী' এবং 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প শিক্ষার্থীদের পড়াশুনোয় উৎসাহ যোগাতে নতুন মাত্রা যোগ করে। ভারত সরকার 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্প নিয়ে এলো। যা ভারতে নারী শিক্ষার হারকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। একদিকে ৩৭০ ধারা

অবলুপ্তি, অন্যদিকে দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের পর রূপান্তরকামীদের স্বীকৃতি ২০১৪ সালে। ৩৭৭ নং ধারা বাতিল করা হয়। যার মধ্যদিয়ে সুপ্রিমকোর্ট রূপান্তরকামীদের সরকারী অনুমোদন দিলেন। এই দশকে 'বডি শেমিং'-এর মতো বিষয় যেমন উঠে এলো তেমনি জিমে গিয়ে শরীরের গঠন ঠিক করার প্রতিও নতুন প্রজন্মের ঝোঁক দেখা দিল। আসলে প্রতিনিয়ত শপিংমলের আগ্রাসী রূপ মানুষের অর্থনীতির মূলে পৌঁছে গিয়েছে। হাতের কাছে এসেছে 'অনলাইন শপিং'-এর অ্যাপ। যা মানুষকে খুব কম সময়ে বিলাসিতার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। অর্থাৎ পণ্য সংস্কৃতির গ্রাসে ভারতবর্ষের মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হচ্ছে। এলোপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে মানুষ একদিকে যেমন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, অন্যদিকে 'মেডিক্যাল টেরিরিজম'-এর ধারণা মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সব মিলিয়ে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দ্বিতীয় ধাপে উপনীত হয়েছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিতে সমকালীন প্রেক্ষাপটকে যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি ভুলে যাননি পূর্ববর্তী দশকের কথাকে।

'নাটাদা' (২০১০খ্রি:) উপন্যাস দিয়ে এ পর্বের সূচনা। উপন্যাসের শুরুতে সমাজ-পরিস্থিতি বদলের চিত্র ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। বাগবাজার এলাকার চিত্র রয়েছে এই উপন্যাসে। নাটা গুণ্ডার গুণ্ডারাজের হালহকিকত এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। উপন্যাস কথকের দৃষ্টিতে নাটাদার জীবনবৃত্তান্ত উঠে এসেছে। আসলে মানবিকতার জায়গা থেকে গুণ্ডাগিরি করতেন নাটাদা। আজকের গুণ্ডাদের সঙ্গে তিনি নিজের সময়ের পার্থক্য খুঁজে পান। সবার প্রিয় নাটাদা আজ বৃদ্ধ। নাটাদা যে একজন সাধারণ মানুষ। তারও স্বাভাবিক অনুভূতি থাকতে পারে সে বৃত্তান্ত এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। নাটাদার গুণ্ডাগিরি জীবনে জবা এবং খেঁদির ভূমিকা তার সংসার জীবনের আধার। পরস্ত্রী জবাকে নিয়ে নাটাদা সংসার করেছে। তাদের সন্তান হয়নি ঠিকই। কিন্তু পাঁচি মাসির মৃত্যুর পর তার পালিত কন্যা খেঁদির দায়িত্ব নাটাদার ওপর পড়ে। কিন্তু খেঁদিকে নাটাদা কোন নজরে দেখবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। খেঁদির উপস্থিতি জবার সঙ্গে সংসার জীবনে ইতি ঘটায়। আসলে মানব মনের অন্তর্গূঢ় কথা তুলে ধরতে স্বপ্নময় চক্রবর্তী সিদ্ধহস্ত। নাটাদার মনের গোপন কথা বেরিয়ে এসেছিল তার উরু থেকে। যে স্থান গোপনীয় সেখানে লেখা খেঁদির নাম। পাঠকের বুঝতে বাকি থাকে না নাটাদা মনের গোপনে কোন ভাবনা লালন করেছিল। কিন্তু বাহ্যিক ভাবে তাকে সন্তানের দায়িত্বে পালন করে বিয়ে দিয়েছিল নাটাদা। একজন সামাজিক মানুষের দায়িত্ব সে পালন করেছিল। একজন গুণ্ডার জীবনের গোপন কোণের চিত্র স্বপ্নময় চক্রবর্তী তুলে এনে বাংলা উপন্যাসের জগতে এক বিরল চিত্র উপস্থিত করলেন। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব। 'পরবাসী' (২০১০খ্রি:) উপন্যাসে

আমেরিকার প্রবাসী বাঙালীর পশ্চিমবাংলায় ফিরে আসার পর আত্মজিজ্ঞাসার কাহিনি বর্ণিত। বসন্তকুসুম চেয়েছিলেন পৈতৃক সম্পত্তি যা আছে সবকিছুর বন্দোবস্ত করে মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সেবামূলক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিছু একটা তৈরি করে দিয়ে দেশে ফিরে যাবেন। আসলে দীর্ঘদিন আমেরিকায় বসবাসের ফলে আমেরিকাই তাঁর স্বদেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তাঁর আত্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে স্বদেশ আর জন্মভূমির মধ্যে তিনি কোনটাকে প্রাধান্য দেবেন ? মন তাঁর কোথায় পড়ে আছে ? আসলে জন্মভূমি যতই অনুন্নত হোক না কেন মন তো সেখানেই পড়ে থাকে। জন্মভূমি যে আত্মার আত্মীয় হয়েই থাকে সে চিত্র অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। পশ্চিমবাংলা এবং আমেরিকার তুলনা উঠে এসে উপন্যাসটিকে নানা ভাবে বর্তমান সময়ের উপযুক্ত করে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। ফলে উপন্যাসটি দু'দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক চিত্রের দলিল বলা যেতে পারে। একটি তথ্যমূলক বিষয়ের সঙ্গে আত্মিক মিলন ঘটিয়ে উপন্যাসটিকে অনবদ্য করে তুলেছেন ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। যা তথ্য বিস্ফোরণের যুগে খুবই প্রাসঙ্গিক।

পরবর্তী উপন্যাস 'কান্তকবি' (২০১১খ্রি:) উপন্যাসে নলিনীকান্তর মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অনামী কবিদের ভবিষ্যৎ। কবিতা চর্চা যে কোন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সঠিক পথ কবিরা জানেন না। তথাকথিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে না ঢুকতে পারলে নলিনীকান্তের মতো সংসারী মানুষদের কবি হয়ে ওঠা হয় না। রাজনৈতিক বাতাবরণ কীভাবে কবি সত্তাকে বিপথে চালিত করতে ব্যস্ত হয় তারও প্রমাণ এই উপন্যাসটি। শত চাপের মুখেও যে কবিসত্তা নিজের পথ বেছে নেয় তার প্রমাণ নলিনীকান্ত। নলিনীকান্তের মত চরিত্র নির্মাণে স্বপ্নময় চক্রবর্তী সিদ্ধহস্ত। উপন্যাস রচনায় 'অবন্তীনগর'-এর পর আর তেমনভাবে চমকিত ভাব নিয়ে না লিখলেও তিনি নিজেকে তৈরি করে চলেছিলেন নানা ভাবে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী ক্ষেত্রসমীক্ষার ওপর ভর করে পরবর্তী উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। যার ফলশ্রুতি 'হলদে গোলাপ' (২০১৫ খ্রি:) উপন্যাস। বৃহৎ ক্যানভাসে রূপান্তরকামী মানুষগুলির ইতিহাসকে তুলে এনেছেন এই উপন্যাসে। উপন্যাসটি 'আনন্দ পুরস্কার'-এ ভূষিত হল। আপাত দৃষ্টিতে উপন্যাসটিকে ডকুমেন্টেশন বলে মনে হলেও এর মধ্যে আছে অনিকেতের জীবন জীজ্ঞাসার বৃহৎ ক্যানভাস। অনিকেত খোঁজ করেছে মানুষের যৌন জীবনের বা যৌনচেতনার অন্তরালে কোন ভাবনা লুকিয়ে থাকে। এই জীবন জিজ্ঞাসার দরুণ উঠে এসেছে মঞ্জু, পরিমল, আইভির মতো মানুষগুলির কথা; দুলালী বা দুলালের অভ্যন্তরে ঢোকার চেষ্টা। সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তিত রূপ মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজিজ্ঞাসার নিরসনও অনিকেত করতে চেয়েছে। 'হিজড়ে' সমাজের অলিগলিতে ঢুকে তাদের জীবন-চর্যাকে বুঝতে চেয়েছেন।

সমকামী, উভকামী মানুষগুলির বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছেন। দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলশ্রুতি ২০১৪ সালে সুপ্রিমকোর্ট রূপান্তরকামীদের সামাজিক স্বীকৃতি দানের বিষয়ে ভেবেছে। কিন্তু ঔপন্যাসিক উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন রূপান্তরকামী মানুষগুলির ভবিষ্যৎ কী এই আইনের দ্বারা সুরক্ষিত হবে? পরিমল অর্থাৎ মঞ্জুর ছেলে যে নিজেকে 'পরি' ভাবতেই বেশি ভালোবাসে সে কি শারীরিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সঠিক জীবন ধারণ করতে পারবে? কোন পথে আমাদের সমাজ ধাবিত হতে চলেছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে। সমাজ-জীবনের অ-চর্চিত ইতিহাস এই উপন্যাসের অঙ্গ। সঠিক যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের মতো দেশে অনুপস্থিত। ফলে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বয়ঃসন্ধিক্ষণের সন্তানদের। নারী পুরুষের যে ধারণা সমাজ আমাদের তৈরি করে দেয় তার ফল ভোগ করতে হয় আমাদেরই। সমাজের ভ্রান্ত ধারণার মূলে কুঠারাঘাতের উপন্যাস 'হলদে গোলাপ'। সমাজ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সঠিক লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চাওয়া মানুষের আখ্যান এই উপন্যাস। ঔপন্যাসিক লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে সঙ্কটে থাকা মানুষগুলির হয়েই যেন বলেছেন—

> *"সেই কবে, কোন আদি-অতীতেও, পুরুষ নারী হতে চেয়েছে বারবার। নারীকেই ভেবেছে সৃষ্টির প্রতীক। নারীই তো জন্ম দেয়। সৃষ্টি বেঁচে থাকে। আফ্রিকার কোনও-কোনও উপজাতি এখনও বিশেষ উৎসব উপলক্ষে নারী সেজে নাচে, লিঙ্গস্থানে লাল কাপড় বাঁধে। যেন ঋতু। শিব তো নিজেকে শক্তির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে অর্ধনারীশ্বর হয়েছিলেন। প্রাচীন মিশরের সূর্যদেবতা নিজের লিঙ্গদণ্ড কেটে ফেলেছিলেন একবার। কর্তিত লিঙ্গরক্ত থেকে জন্ম নিয়েছিল নতুন মানুষরা, একটা নতুন জাতি। কোনও কোনও পুরুষের মনে নারী হওয়ার আদিম ইচ্ছের চোরকাঁটা বিঁধে আছে এখনও।"*[২]

মানুষের অন্তর্গূঢ় অন্তরের কথা বলবেন ঔপন্যাসিক, এটাই কাম্য। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী আরও একধাপ এগিয়ে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত। এখানেই তিনি স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। ইতিপূর্বে বাংলা কথাসাহিত্যে লিঙ্গ পরিচয়ের দ্বন্দ্বে থাকা মানুষগুলিকে নিয়ে রচিত গ্রন্থে তাঁদের মানসিক পর্যায় এবং সামাজিক অবস্থানের আংশিক চিত্র উঠে এসেছে। শ্রীপান্থের লেখা 'হারেম' (১৯৬৭খ্রি:) গ্রন্থটিতে তুর্কি সুলতানদের, মুঘল সম্রাটদের এবং লক্ষ্ণৌ নবাবদের যৌন জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সূত্রে এসেছে হারেমের ভিতরের চালচিত্র এবং হারেমের প্রহরী খোজাদের জীবনবৃত্তান্ত। এর পরেই উল্লেখ করা যায় সমরেশ বসুর 'বান্দা' (১৯৬৮খ্রি:) উপন্যাসের কথা।

বাংলা সুলতানি আমলের মাহমুদশাহী বংশের জালালউদ্দীন শাহের নিকটস্থ খোজা বারবকের জীবনযন্ত্রণার চিত্র উঠে এসেছে। বাল্যকাল থেকে বারবক কীভাবে যৌন শোষণের শিকার হয়েছিল সে চিত্র গ্রন্থটিতে রয়েছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' (১৯৭২খ্রি:) উপন্যাসে উঠে এসেছে আলকাপ দলের 'ছোকরা'দের কথা। উপন্যাসের প্রথম পর্বে শান্তি এবং দ্বিতীয় পর্বে সুবর্ণ এই দুই চরিত্রের উপস্থিতি উপন্যাসটিকে লিঙ্গ পরিচয়ের সংকটে থাকা মানুষের চিত্রকে প্রকাশ করে। তবে শান্তি পূর্ণরূপে পুরুষ, কিন্তু সুবর্ণ পুরুষের মধ্যে নারীসত্তাকে বহন করে। অর্থাৎ সুবর্ণের মধ্যে রূপান্তরকামী মানসিকতাকে লক্ষ করা যায়। এই দুই চরিত্রকে নিয়ে উপন্যাসটির বৃহৎ পটভূমি রচিত হয়েছে। নবনীতা দেবসেনের 'বাপরে বাপ!' (১৯৮১খ্রি:) গল্পটির কথা বলা যায়, যেখানে সোমেশবাবু বিবাহিত পুরুষ। তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রাণী এবং দুই পুত্র সন্তান রয়েছে। কিন্তু তিনি নারী শরীর কামনা করেন। এক সময় বাড়ির কাউকে না জানিয়ে তিনি মুম্বাই পাড়ি দেন। সেখান থেকে নিজের শরীরে হরমোন থেরাপি এবং অস্ত্রপচার করে নারী হয়ে বাড়ি ফেরেন। তাকে ঘিরে স্ত্রী-সন্তাদের মানসকিতার বদলই গল্পটির মূল পটভূমি। এরপর কবিতা সিংহের 'পৌরুষ' (১৯৮৪খ্রি:) উপন্যাসের কথায় উঠে এসেছে সখীসোনার প্রতিবাদী জীবন সংগ্রামের কাহিনি। নব্বইয়ের দশকের প্রকাশিত কমল চক্রবর্তীর 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণ' (১৯৯৩ খ্রি:) উপন্যাসে বৃহন্নলাদের ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে। হিজরা সমাজের রূপান্তরকামী পুরুষ চরিত্রের কাহিনি এবং তাদের আচার-সংস্কারের বিচিত্র অলিগলির চিত্র উপন্যাসটিতে স্থান করে নিয়েছে। তিলোত্তমা মজুমদারের 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' (২০০৩ খ্রি:) উপন্যাসে নারীর সমকামিতা নিয়ে লিখেছেন। তিনি সামগ্রিক ভাবে সমাজ-পরিবেশের ভিত্তিতে বিষয়টিকে তুলে ধরেননি। কারণ যে সময় উপন্যাসটি লেখা হয়েছে সে সময় সমকামী নারী পুরুষের নিজেদের পরিচয় প্রতিষ্ঠা দানের লড়াইয়ের ময়দানে উপস্থিত। ফলে নারী সমকামীদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানকেই শুধু তিলোত্তমা মজুমদার তুলে ধরেছেন। বাণী বসুর 'স্বপ্নময়' (২০০৮ খ্রি:) উপন্যাসটিতে স্বপ্নময় ছেলেবেলা থেকেই মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে পছন্দ করত। যার জন্য বাড়ির সকলের তিরস্কারে সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বপ্নময় কীভাবে নিজের সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে তার চিত্র উপন্যাসটিতে রয়েছে। আসলে সমাজ বদলের ইঙ্গিত উপন্যাসটিতে স্থান করে নিয়েছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী যখন 'হলদে গোলাপ' লিখেছেন সে সময় সমাজ পরিণতির পথে, স্বীকৃতির পথে এগিয়ে গিয়েছে। ফলে তাঁর পক্ষে সামগ্রিক ভাবে রূপান্তরকামীদের জীবনকে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে, যা তাঁকে আলাদা মাত্রার ঔপন্যাসিক করে তুলেছেন।

'ভেজাবারুদ' (২০১৬) এক অন্য মাত্রার উপন্যাস। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি নির্মিত। বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা সাধারণ মানুষের জীবনকে কীভাবে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায় তার চিত্র উপন্যাসটির মধ্যে রয়েছে। হরিপদ চক্রবর্তীর হেনস্থা, পাড়ায় পাড়ায় মস্তানরাজ, ক্ষমতায়নের জোরের প্রতিরূপ গুরুপদ কর্মকারের ছক কষা জীবন আমাদের সামনে বর্তমানের চালচিত্র। চানুর মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের স্বার্থপর, সুবিধাবাদী মানসিকতা প্রকাশ পায়। সুলতার মতো মেয়েদের ধর্ষণের চিত্র আজকালের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। পরিবারকে শাস্তি দিতে রাজনৈতিক নেতারা আজ ধর্ষণকে বেছে নিয়েছে। ফলে সমাজ ক্রমশ অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছে তার প্রমাণ 'ভেজাবারুদ'। ঔপন্যাসিক খুব সাধারণ পরিবারের কাহিনিকে উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু এই সাধারণ মানুষগুলির জীবন কীভাবে ক্ষমতায়নের রাজনীতির চাপে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তার চিত্রই 'ভেজাবারুদ'। স্বপ্নময় চক্রবর্তী হরিপদ চক্রবর্তীর মতো মানুষের চিত্র অঙ্কনেই বেশি নজর দেন। তাঁর উদাহরণ এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় বিবৃত।

আরও একটি অনবদ্য উপন্যাস 'কথাবলা পুতুল' (২০১৭ খ্রি:) বাঙালি কর্মরতা মহিলার জীবনচিত্র নিয়ে এই উপন্যাস। তবে এই উপন্যাসের কর্মরতা মহিলা কোনো নামিদামী কোম্পানি বা অফিসের কর্মরতা নয়। সে শ্রমিক শ্রেণির মহিলা। সংসার প্রতিপালনে যে মেয়েদের অনেক কম বয়সেই কর্মজগতে পা রাখতে হয় তাদের কাহিনি 'কথাবলা পুতুল'। মহামায়াকে অর্থ উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করার সঙ্গে দেহদানও করতে হয়েছে বহুবার। এহেন মেয়েদের সংসার হয় ঠিকই কিন্তু স্থায়িত্ব পায় না। মহামায়ার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেলে কন্যা ও পুত্র সন্তানের জন্য তাকে আবার কর্মসংস্থানের পন্থা অবলম্বন করতে হয়। মনসারামের কোম্পানিতে চাকরি করলেও মাঝে মধ্যেই তার যৌন ভোগ আকাঙ্ক্ষার শিকার হতে হয় মহামায়াকে। মনসারামের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার অবশ্য অন্য কারণও রয়েছে। পুত্র-কন্যার মুখে একটু ভালো খাবার, একটু ভালো স্কুলে পড়ানো। মনসারামের পরে দিবাকরের কবিরাজি ওষুধ কোম্পানীতে কাজ শুরু করে মহামায়া। দিবাকরের পাগল বউ পারুল। মহামায়ার রূপ সৌন্দর্য দিবাকরকে আকর্ষণ করলেও সে ভোগলালসায় নয়, প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল মহামায়াকে। পারুলের অসুস্থতা মহামায়া ও দিবাকরের মনের গোপন ইচ্ছেকে লালন করেছিল ঠিকই, কিন্তু দিবাকরের আকস্মিক মৃত্যু মহামায়ার সামনে এক কঠিন সময়কে উপস্থিত করে। দিবাকরের পাগল বউয়ের দায়িত্ব তার ওপর আসে। ফলে কবিরাজি ওষুধ ফেরি করে যে ক'টাকা উপার্জন হয় তাতে ছেলের পড়াশুনো এবং পারুলের চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। বাধ্যতামূলক ভাবেই মহামায়াকে আবার দেহ পসারিণী হতে হয়। জীবন ধারণের

আকাঙ্ক্ষা একটি মেয়েকে কোন পথে চালিত করে তার ইতিহাস এই উপন্যাস। মহামায়ার মতো মেয়ের জীবন যন্ত্রণার ইতিহাস 'কথাবলা পুতুল'। আসলে জীবন সংগ্রাম তো এভাবেই চলতে থাকে। মহামায়া চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক এমন এক মেয়ের চরিত্র অঙ্কন করেছেন যে পরিস্থিতির দাস হয়ে হারতে শেখেনি। লড়াই করে, দরকারে দেহকে মনসারামের ভোগ্যপণ্য করে পারুলকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। কারণ, দিবাকরের মনটি যে মহামায়ার কাছে বাঁধা পড়েছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে পারুলের মনে। তাই মহামায়া হয়ে উঠেছে পারুলের আশ্রয়। তাই পারুল বলে—

> *"মহামায়াকে বলে, তুমি গাছ। গাছে পাখি। পাখি আসবে। আমার কোকিল পাখি।"*[৩]

মহামায়ার জীবন যন্ত্রণার উত্তরণ ঘটে ঔপন্যাসিকের বেহুলা প্রসঙ্গ আনয়নে। বেহুলা বুকে যন্ত্রণা নিয়ে দেবসভায় উদ্দাম নৃত্য পরিবেশন করেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল একটাই। স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়া। মহামায়া আজকের বেহুলা। হাজার যন্ত্রণা সত্ত্বেও শুধু জীবনের তাগিদে সে দেহকে পণ্যসামগ্রী করে তোলে। মহামায়ার অবলম্বন কোনো অদেখা যন্ত্রণা। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী বর্তমান সময়ের একশ্রেণির নারীদের জীবনচিত্রের মধ্যদিয়ে তাদের সংকটের চিত্র অঙ্কন করেছেন, যা সমসাময়িক উপন্যাস থেকে আলাদা মাত্রা সংযোগ করে।

'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ' (২০১৬ খ্রি:) একটি অনবদ্য উপন্যাস। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে বাস্তব জীবনচর্যার রসদকে ঔপন্যাসিক মিলিয়ে দিয়েছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড. নারায়ণচন্দ্র রানা ও শিক্ষক মণীন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ির জীবন-কাহিনি এই উপন্যাসের কথাবস্তু। প্রেক্ষাপটে রয়েছে সুন্দরবন এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল। সেখান থেকে কীভাবে এক শিক্ষকের নিরন্তর উৎসাহে ছাত্রের বিজ্ঞানী হওয়ার সাধনা সফল হয় তার ইতিহাস এই উপন্যাসে রয়েছে। মণিলাল স্যার সেই শিক্ষক যিনি— ছাত্রদের প্রকৃতির মধ্য থেকে বাস্তব বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ভূগোলের শিক্ষা দেন। এক ঘরামির বৃত্তিধারী পরিবার থেকে নয়নচাঁদের মতো ছেলে কীভাবে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বিদেশে গবেষণার জন্য ডাক পায় এবং সফল হয়ে দেশে ফিরে আসে সে কাহিনি উপন্যাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। পাউডার কৌটোর মতো তুচ্ছ জিনিসকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রদের গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে তা এই উপন্যাসে রয়েছে। কিন্তু মণিলাল স্যার একজনই নয়নচাঁদ তৈরি করতে পেরেছিলেন। যে সময় নয়নচাঁদের মতো ছাত্র তৈরি হয়েছিল সে সময়ের ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে শিক্ষার মূল্যমান বজায় ছিল। কিন্তু আজ ছাত্রদের সামনে অতিদ্রুত সফলতা অর্জন, অর্থ উপার্জনই

বেশি প্রাধান্য পায়। এই ভাবনা বিশ্বায়নের তৃতীয় পর্যায়ের ফলশ্রুতি, তাই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় নয়নচাঁদ আর তৈরি করা হয় না মণিলাল স্যারের মতো আত্ম-অনুসন্ধিৎসু স্যারেদের। চরিত্রের অনবদ্যতাকে তুলে ধরতে গিয়ে সময়ের প্রেক্ষিতে চরিত্রটিকে মূল্যায়ন করে নিতে চান ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। তাই বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান বিষয়ক উপন্যাস নির্মাণে তাঁর এই উপন্যাস বিশিষ্টতার দাবী রাখে।

'দুনিয়াদারি' (২০১৬ খ্রি:) উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র। আকিল মুনশির মতো দিনমজুরের জীবনে ধর্ম সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারে না। সে জানে রুজি-রুটির তাগিদে তার দোষ-ত্রুটিকে আল্লা ক্ষমা করে দেবেন। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে চলতে চাওয়া আকিলের বাড়ি 'পাগল' পোষার বাড়ি হয়ে ওঠে। প্রথম প্রথম একাজে উৎসাহ পেলেও পরে বিষয়টি তার কাছে বোঝা মনে হয়। কিন্তু আকিল কীভাবে আরও মানসিক রোগীর আশ্রয়স্থল হয়ে উঠল তা উপন্যাসটির নির্মাণ কৌশলে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'শেকড় ছেঁড়া' (২০১৭খ্রি:) অন্যমাত্রার উপন্যাস। উদ্বাস্তু মানুষগুলির স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে থাকার গল্প এই উপন্যাসে রয়েছে। একটি উদ্বাস্তু পরিবারের দ্বিতীয় প্রজন্মের চোখ দিয়ে উপন্যাসটির প্রেক্ষাপটকে বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক। অন্যান্য উপন্যাস থেকে এই উপন্যাসের আলাদা হয়ে যাওয়ার চিত্র স্পষ্ট হয় এযুগের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ছিন্নমূল মানুষগুলির আবেদনকে দেখার দৃশ্যে। শিবব্রত ছিন্নমূল পরিবারের দ্বিতীয় প্রজন্মের বাহক হয়েও সে তাদের উদ্বাস্তু কলোনিতে থাকেনি। চাকরি পেয়ে নিজের আখের গুছিয়ে সে সল্টলেকে বাড়ি করেছে। তার সন্তান যারা উদ্বাস্তু পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম; তারা কেউই শেকড়ের সন্ধান করেনি। তাদের শেকড় প্রথম থেকেই ছিন্ন। কীভাবে একে একে প্রত্যেকের শেকড় ছিঁড়ে গিয়েছে সে ইতিহাস এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। 'চার ডাক্তার' (২০১৮ খ্রি:) এবং 'কিছু একটা হয়ে যাবে' (২০১৯ খ্রি:) উপন্যাস দুটির বিষয় মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞান। 'চার ডাক্তার' উপন্যাসে চার ডাক্তার আসলে একটি সত্তা বহনকারী। বর্তমান সময়ে চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতি রোগীর আস্থা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আস্থা ভঙ্গের ঘটনা দ্বারা আবৃত। ফলে চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে 'মেডিক্যাল টেররিজম' নামক এক বিভীষিকা মানুষের মধ্যে দানা বেঁধেছে। 'চার ডাক্তার' উপন্যাসের শেষ অধ্যায় 'ডাক্তার' বিশেষণহীন' নামক অংশে ডাক্তারি পেশার মূলসূত্র নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক। যেখানে উচ্চারিত হয়েছে ডাক্তারি শপথের পাঠ। যে আতঙ্ক, যে নিরাপত্তাহীনতা, যে দ্বিচারিতার সম্মুখীন হয়ে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর মানুষের দোলাচলতা সৃষ্টি হয় তা থেকে উত্তরণের পথ উপন্যাসটির মধ্যে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন। 'কিছু একটা হয়ে যাবে' উপন্যাসে

এইডস্ নামক রোগকে কেন্দ্র করে অন্ধবিশ্বাসের ফল কীভাবে মানুষের জীবন-যাপনকে জটিল করে তোলে তার চিত্র রয়েছে। একুশ শতকে যেখানে শিক্ষার প্রসার সর্বত্র, সেখানে দাঁড়িয়ে কীভাবে সমাজের কিছু শ্রেণির মানুষের অন্ধ-সংস্কারের বশে সমাজের অবক্ষয় নেমে আসে তার চিত্র এই উপন্যাসে রয়েছে। রয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জয়যাত্রার মুখে মানবিক অবমূল্যায়নের চিত্র। অর্থাৎ একুশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে উপন্যাস রচনা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাসের জগতকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে। বিশেষ করে 'চার ডাক্তার'-এর মতো উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের জগৎকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছে বিষয় ভাবনার দিক দিয়ে। এবং চরিত্রের আত্মজিজ্ঞাসা উপন্যাসটির নির্মাণ কৌশলকে বিশিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করে।

৪

একুশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বাংলা উপন্যাসের সমারোহে বেশ কিছু উপন্যাস আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তার মধ্যে বাণী বসুর 'খনামিহিরের ঢিবি', রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ধনপতির সিংহল যাত্রা', কিন্নর রায়ের 'অন্ধকোকিলের গান', আফসার আহমেদের 'সেই নিখোঁজ মানুষটা', নলিনী বেরার 'সুবর্ণরেখা সুবর্ণরেণু', সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন'-এর মতো উপন্যাস বাংলা উপন্যাসে রুচির বদলকে চিহ্নিত করে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন অনেক পরে। কিন্তু হাত দেওয়ার পর উঠে এসেছে একের পর এক বিষয়। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যে ক'টি উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন তার মধ্যে 'হলদে গোলাপ', 'কথাবলা পুতুল', 'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ', 'চার ডাক্তার' উপন্যাস বিষয়বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে অনন্য। একুশ শতকের পাঠকের রুচির বদল ঘটেছে। তারা নিতান্ত গল্প পরিবেশনকে পছন্দ করেন না। তথ্য পরিবশেন যার ফলে অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। সাহিত্যিকদের লেখার জগতে পাঠকদের রুচির তাগিদ ঢুকে পড়েছে। বিশ শতকের প্রখ্যাত লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর রিপোর্টাজ ধর্মী লেখায় পাঠকদের মন ভুলিয়েছিলেন। কিন্তু একুশ শতকে সে পদ্ধতি বহুল প্রচলিত হলেও পাঠক খোঁজে অন্যকিছু। পাঠকের চাহিদা পূরণ করতেই যেন কথাসাহিত্যিকরা মাধ্যম হিসেবে বেছে নিলেন ক্ষেত্রসমীক্ষাকে। গল্প, উপন্যাসের পাতায় আজ তথ্যবাহুল্য চোখে পড়ার মতো। কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী সমকালীন লেখক থেকে আলাদা হয়ে যান এখানেই। শুধু লেখক সত্তাই স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে তথ্যসংগ্রহে বাধ্য করে তা নয়। আসলে তাঁর স্বভাব দু'চোখ ভরে পৃথিবীটাকে দেখা। যার ফলে তিনি সাহিত্যের পাতায় প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে তথ্য পরিবেশন করেন। তাছাড়া সময় ব্যবহার

করার জন্য তিনি পড়াশোনা করেন। ফলে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এদুয়ের মিলিত সত্তা আমরা গল্প, উপন্যাসের পাতায় পেয়ে যাই। তাঁর প্রথম তথ্য সমৃদ্ধ উপন্যাস 'নবম পর্ব'। পরবর্তী 'অবন্তীনগর' উপন্যাসের কথা বলা যেতে পারে। দীর্ঘ ইতিহাসকে তুলে আনতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে সময়-পরিসরের তথ্যবহুল ঘটনা। যা যুগবদলের পরিচায়ক। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে মেয়েদের কর্মসংস্থানের পরিসরের বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। 'পার্লার' যার বড় উদাহরণ। অলিতে গলিতে ধীরে ধীরে মেয়েরা অর্থ-উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে 'পার্লার'-কে বেছে নেয়। প্রসঙ্গক্রমে শহীদবেদীর স্থান্তরের প্রসঙ্গটি ব্যাঙ্গাত্মভাবেই ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তুলে ধরেছেন 'অবন্তীনগর' উপন্যাসে সত্যচাঁদের বক্তব্যে—

> *"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকের শহীদ বেদী। স্বাধীনতা পাইবার পরও কত রকমের শহীদ বেদী হইল। ট্রাম আন্দোলনের শহীদ, খাদ্য আন্দোলনের শহীদ, নকশাল আন্দোলনের শহীদ ...। কিছুদিন আগে বাগবাজারে ভাইয়ের বাড়িতে গিয়াছিলাম। দুর্গাচরণ মিত্রের গলির আগে বাগবাজারে ভাইয়ের বাড়িতে গিয়াছিলাম। পাইলাম না। শুনিলাম যে মাঠে শহীদ বেদীটি ছিল, সেখানে একটি মেয়েদের চুলকাটার সেলুন হইয়াছে। বেদীটি ভাঙিয়া দেয়া হইয়াছে। পরে জানিলাম ওই টুকরো জমিটি শীলেদের। শীলেদের গৃহবধূরা ওই চুলকাটার দোকানটি খুলিয়াছে। হায়! ১৯৫০ সালেও বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া শীলেদের ঘরের বৌরা বাহির হইবার কথা ভাবিতে পারিত না।'*[৪]

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'ডকু-ফিকশান'-এর বড় উদাহরণ হিসেবে 'হলদে গোলাপ'-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে উপন্যাসটি ডকু-ফিকশনের গণ্ডী পেরিয়ে মানবিকতা এবং ব্যক্তি চরিত্রের অন্তর্গূঢ় রহস্য উন্মোচন করায় তা আলাদা মাত্রার উপন্যাসের পর্যায়ে চিহ্নিত হয়। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাসের মধ্যে আমরা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বেশি পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাই। যদিও এই বিষয়গুলিই তাঁকে স্বতন্ত্র করে তোলে। তাঁর প্রধান আকর্ষণ মানব চরিত্রের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন। এর ফলে মানব জীবনের অনিশ্চয়তা নিয়ে তাঁকে চিন্তিত হতে দেখা যায়। যার প্রমাণ 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে পরি, মঞ্জু এবং দুলালীর জীবনবৃত্ত।

তিনি লক্ষ করেছেন মানবমনের চাহিদা পাহাড় প্রমাণ। নতুন প্রজন্মের মধ্যে যে প্রবণতা অনেক বেশি। নব্বইয়ের দশকে প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে যে প্রেরণা দেখা যায় না, একুশ শতকের প্রথম দশকের রচিত উপন্যাসে সে যাত্রা শুরু হয়। 'চলো দুবাই' উপন্যাসের মধ্যে সে মানসিকতা

ধরা পড়েছে। নবীন প্রজন্মের ধ্যান ধারণা রুচিবোধের পরিবর্তন উপন্যাসটির প্রতিটি পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের দিন দিন ব্যস্ততা বেড়ে চলেছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী মানুষের পরিবর্তনের চিত্র আঁকেন। মানুষের পরিবর্তনের তাগিদ কীভাবে আমাদের প্রতিবেশকে পাল্টে দেয় তার চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন—

> *"সবাই বড় ব্যস্ত পুরো নাম কেউ বলে না। কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু রোডের দোকানের সাইনবোর্ডে এখন এনএসসি বোস রোড। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড হয়ে গেছে এপিসি রায় রোড। কলোনিতে ঢুকবার ঠিক মুখটাতেই নতুন স্টুডিও, লেখা বি:দ্র: এক মিনিটে রঙিন ছবি। এই কলোনির মধ্যে অটোমেটিক জেরক্স-এর দোকান, কেক, পেস্ট্রি-এর দোকান, রোল-এর দোকান, সব ফাস্ট ফুড। লোকের সময় নেই।"*[৫]

যাপিত সময়ের মধ্যে মানুষ একদিকে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে 'ভোকাল' হয়েছে। অন্যদিকে 'মিডিয়া'র বাড়বাড়ন্ত রূপ বাক্‌রুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক বোধের জাগরণকে, স্তব্ধ করে দিতে 'মিডিয়া'-র দোসর মেলা ভার। 'নবম পর্ব' উপন্যাসের চিত্রে স্বপ্নময় চক্রবর্তী তার কিছুটা আভাস দিয়েছেন। যন্ত্র নির্ভর জীবন মানুষের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটতে দেয় না। 'কম্পিউটার গেম্‌স' তার উদাহরণ। আসলে স্বপ্নময় চক্রবর্তী মানুষের ভিন্ন স্বর অনুসন্ধান করেন। তাই তিনি প্রায়ই ফিরে গিয়েছেন মাটির কাছাকাছি মানুষগুলির মধ্যে অনন্য রূপের সন্ধানে। 'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ' উপন্যাসে সুন্দরবন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায় পাঠক। তাদের জীবন-যাত্রায় পরিবর্তনের হাওয়া কীভাবে প্রভাব ফেলে তার চিহ্ন উঠে আসে। 'যে জীবন ফড়িংয়ের' উপন্যাসে অর্জুনের মধ্য দিয়ে পাঠক পৌঁছে যায় গ্রামীণ জীবনের রাজনৈতিক পালা বদলের পরিণামগত দৃশ্যে।

বিশ্বায়নের প্রভাব মানব মনের প্রকৃতির বদল ঘটায়। জীবন ও জীবনের জন্য সম্পর্কের মাঝে শর্ত এসে উপস্থিত হয়। স্বপ্নময় চক্রবর্তী যুগ বদলে মানব মনের প্রকৃতি বদলের চিত্রকে তুলে ধরেছেন 'পরবাসী' উপন্যাসের মধ্যে। রূপান্তরকামী মানুষগুলো তার নিজের মনের মতো করে বাঁচতে চায়। কিন্তু সমাজ তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে বাঙালি পিতা মাতাদের মধ্যে সন্তানের স্বাভাবিক বাঁচার পথকে সুগম করার দিকে যে নজর পড়েছে সে বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। 'হলদে গোলাপ' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শরীর আর মনের পার্থক্য আছে। সিমোন দ্য বেভেয়ার যে ভাবে নারীর সংজ্ঞা নির্মাণ করেছেন বা সমাজে নারীর অবস্থান নির্দেশ করেছেন তা

অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সমাজে শুধু নারীরাই শোষিত নয়; সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামীরাও সমানভাবে নির্যাতিত। স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাদের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন। সঙ্গে তুলে ধরেছেন তাদের লড়াইয়ের ইতিহাস। তাঁর প্রেরণা বাস্তবের মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষেরা। স্বপ্নময় চক্রবর্তীও উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন— লিঙ্গ চিহ্নই কী সব? সমকাম কোথায়? শরীর না মনে? তিনি উত্তর খুঁজে পান সমকাম জীবের প্রাকৃতিক বৈচিত্রময়তার একটি অঙ্গ। মানুষ যে বহুস্বর নিয়ে উপস্থিত হয় সেই বহুস্বরের পরিণাম লিঙ্গ পরিচয়ের বিকৃতি। প্রকৃতির নিজস্ব সৃষ্টি রহস্যের মধ্যেই লিঙ্গ পার্থক্য তৈরি হয়। কিন্তু সমাজ মানুষ প্রকৃতির রহস্যকে বুঝতে পারে না। তাই লিঙ্গ ও মনের মেলবন্ধনে বাঁচতে চাওয়া মানুষগুলোকে আমরা আলাদা করে রাখি। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে তিনি লিঙ্গান্তরকামীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। কারণ সমাজের বদল ঘটেনি এখনো পুরোপুরি। ফলে সমাজের মাঝে রূপান্তরকামীদের স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে চাওয়ার পথে তাদের ইচ্ছে ডানাই পতনের মূল হবে না তো? এই জিজ্ঞাসা ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর।

চরিত্রের আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে বেড়ান স্বপ্নময় চক্রবর্তী। স্বপ্নময় চক্রবর্তী নারীবাদ নিয়ে বেশি কথা বলেননি। তবে নারীজাতিকে নিয়েও তাঁর আলাদা ভাবনা রয়েছে। মেয়েদের প্রতিটি মননবৃত্তিকে তিনি এমনভাবে তুলে ধরেন যেন নারীচরিত্রগুলির স্পষ্ট রূপ ফুটে ওঠে। ভিন্ন শ্রেণির নারী চরিত্রকে উপন্যাসে স্থান দিয়ে তিনি নারী চরিত্রের ভিন্ন মনোভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 'মহামায়া' উপন্যাস নারী চরিত্রের একটি রূপকে পরিস্ফুট করে। সংসার এবং জীবন ধারণকে কীভাবে একটি নারী তার শেষতম সম্বল দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করে, তার স্বর তুলে এনেছেন উক্ত উপন্যাসে। মহামায়া চরিত্র সৃজনে স্বপ্নময় চক্রবর্তী অন্যভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। মহামায়ায় ওপরে ঘটে যাওয়া নৃশংস শারীরিক শোষণের চিত্রের মধ্য দিয়ে নারীজাতির ওপর অত্যাচারের দিকটি চিহ্নিত করে। উপন্যাসটির একটি পরিচ্ছেদ 'মেয়েবেলা'। শুরুতেই তিনি মহামায়া সহ অন্যান্য শোষিত মেয়েদের কথা তুলে ধরেছেন—

> *"মহামায়া তসলিমা নাসরিনের নাম শোনেনি। মহামায়া যদিও ওর মেয়েবেলাটা ঠিকমতো লিখতে পারত, তাহলে দেখা যেত তসলিমার সঙ্গে অনেক মিল আছে। আসলে অনেকের মেয়েবেলাই ওরকমই। সবাই বলতে পারে না। মানিকতলার রাস্তায় একটা পাগলি মেয়ে ঘোরে। মাথায় খাংলা চুল। বুকটা কখনোই উদলো করে না। ব্লাউজটেলাউজের ওপর গামছা বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে ঢেকে রাখে। ও নাকি বলে বেড়াত ওর গল্প। ওকে ল্যাংটা করার গল্প,*

ধর্ষণ করার গল্প। ওর কোনো এক কাকার কথা, কোনো এক দোকানদারের কথা, কোনো এক পুলিশের কথা ...। ওর এখন জিভ কাটা। কে বা কারা কেটে দিয়েছে, তবু বক বক করে যায়। ও জানে ও বলছে, কথা বলছে, ওর মেয়েবেলা বলে যাচ্ছে ...''[৬]

শুধুমাত্র মহামায়া নয়, পারুল এবং 'অবন্তীনগর' উপন্যাসের তৃপ্তির মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণ সেই যৌন শোষণের ঘৃণ্য রূপ। ঔপন্যাসিক প্রতিটি উপন্যাসের পরিসরে উঠে আসা নারী চরিত্রগুলির জীবন জিজ্ঞাসার ভিন্ন মাত্রা রচনা করেছেন। অন্যদিকে তাঁর পুরুষ চরিত্র নির্মাণের কথা বলাই বাহুল্য। এক্ষেত্রে বলা যায় স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণে অত্যন্ত সচেতন। তাঁর উপন্যাসে সময় বদলে মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার বদল ঘটে— সে বিষয়টির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নারী-পুরুষ চরিত্র নির্মাণের মধ্যে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাসে উদ্বাস্তু নিয়ে একটি আলাদা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। তিনি নিজে উদ্বাস্তু পরিবারের দ্বিতীয় প্রজন্ম। ফলে উদ্বাস্তু জীবনের প্রতি তাঁর একটা আলাদা ঝোঁক রয়েছে। আসলে খুব ছোটবেলা থেকেই উদ্বাস্তু মানুষগুলোর মানসিক অবস্থার সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, মা, বাবা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা দেশভাগের সময় এপার বাংলায় চলে এসেছিলেন, যাঁরা সারাজীবন ওপার বাংলাকে বহন করেছেন নিজের সত্তায়। ফলে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর মানস গঠনে বড় ধরনের ভূমিকা নিয়েছিল ছিন্নমূল মানুষগুলো। যার প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যে স্পষ্ট হয়েছে। প্রথম উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী' থেকে শুরু করে 'কিছু একটা হয়ে যাবে' পর্যন্ত উপন্যাসের ধারায় বেশিরভাগ জায়গায় তিনি প্রসঙ্গক্রমে উদ্বাস্তু মানুষগুলোর জীবন-যাপন এবং পরিবর্তনের চিত্রকে তুলে ধরেছেন। উদ্বাস্তুরা কীভাবে কলকাতার বুকে কলোনি তৈরি করল, কীভাবে তারা বাস্তুহারা থেকে বাস্তুবান হওয়ার পথে এগলো তার চিত্র আঁকতে তিনি বহু সময় ব্যয় করেছেন। 'শেকড় ছেঁড়া' উপন্যাসের মধ্যে তিনি সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রকে সংযুক্ত করে উপস্থাপন করেছেন। সেখানে ছিন্নমূল মানুষগুলোর জীবন-যন্ত্রণার চিত্র ধরা রয়েছে। ভবিষ্যৎ আশঙ্কার চিত্রও তিনি তুলে ধরেছেন। কারণ উদ্বাস্তু পরিবারের আগামী প্রজন্মের কাছে উদ্বাস্তুদের গল্প নিতান্তই গল্পমাত্র হয়ে থেকে যাবে। তারা ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণাকে অনুভব করবে না। পরিবর্তন বা উন্নয়ন সমস্ত পুরোনোকে স্মৃতিমাত্র করে দেয়, অপ্রয়োজনীয় করে দেয়। আসলে মানুষ ক্রমশ পরিবর্তনশীল। ফলে মানুষ যে নিজের তাগিদেই শেকড় ছেঁড়া হয়ে যায় তা এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। আসলে বর্তমান সমস্যার দিকে স্বপ্নময় চক্রবর্তী অত্যন্ত যত্নবান পর্যবেক্ষণকারী। ফলে তাঁর হাত দিয়েই

'চার ডাক্তার'-এর মতো উপন্যাস রচনা হয়।

সারা পৃথিবী ব্যাপী যখন অসুস্থতা জীবন-যাপনের মূল শর্তকে বিঘ্নিত করে, তখন মানুষের আশ্রয় স্থল হয় চিকিৎসকেরা। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, তার নতুন আবিষ্কারের দিকে মানুষ চেয়ে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসা জগতের দুর্নামের চিত্রও আমাদের সামনে কম উঠে আসেনি। কিন্তু সব কিছুর উপরে আমরা যেভাবে চিকিৎসকের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ি তখন ডাক্তারই হয়ে ওঠেন ত্রাণকর্তা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। 'চার ডাক্তার' উপন্যাসের মধ্যে মানুষের জিজ্ঞাসার নিরসন করেছেন অংশুমানবাবুর মতো ডাক্তারের চরিত্রের ভিন্ন স্বর জাগিয়ে তুলে। এখানেই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর স্বাতন্ত্র্য। তিনি চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করেন। উপস্থাপিত চরিত্রের মধ্যদিয়ে মানবতার প্রতি আস্থা প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। জীবনের গতিময়তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। আসলে মানবজীবনের ইচ্ছা, অভীপ্সা, আকাঙ্ক্ষার মতো বিষয়গুলো যে শেষ হয়ে যায় না, সে চিত্র তিনি বহু মানুষের ক্যানভাসে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে যান। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস এই বিশেষ কারণেই সমকালের ঔপন্যাসিকদের থেকে তাঁকে আলাদা করে দেয়। তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক মানসিকতার প্রভাব তাঁর উপন্যাসের পাতায় প্রমাণ রেখে যায়। তিনি যে তথ্য ও প্রমাণ ব্যতিরেকে কিছু বলেন না তার পরিচয় তাঁর সাহিত্যে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। যার ফলে সমকালীন লেখকদের থেকে স্বপ্নময় চক্রবর্তী বহুমাত্রিকভাবে স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার।

শুধু অভিজ্ঞতা নয় স্বপ্নময় চক্রবর্তীর সাহিত্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রভাবও তাঁর অন্যান্য সাহিত্যের উপর পড়েছে। তাঁর রচনাগুলিতে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপার জ্ঞান আর জীবনানন্দ দাশের বিস্ময়বোধকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর রচিত উপন্যাস, ছোটগল্পগুলিতে বারেবারেই রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন, সাহিত্য সৃষ্টির পংক্তি ঘুরে ফিরে এসে সাযুজ্য রক্ষা করেছে। জীবনানন্দ দাশ কাহিনি রচনার সময় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছেন কায়া নির্মাণের ক্ষেত্রে। শব্দ ব্যবহারে যেখানে অনেক লেখকই আড়াল বেছে নিয়েছেন সেখানে স্বপ্নময় চক্রবর্তী জীবনানন্দের ভাবনায় ভাবিত—

> *"শব্দের অশ্লীলতা নেই, শিখেছি জীবনানন্দে। তিনি তৎসম শব্দের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন দিশি, কথ্য, স্লাং, জনবুলি; সনেটে ঢুকে যায় কথোপকথন। এই সব শব্দমায়া আমাদের অজান্তেই আমাদের গদ্যে ঢুকে গেছে। ... গদ্য ও পদ্যের পৃথক শব্দভাণ্ডারের ধারণায় বিশ্বাস ছিল না জীবনানন্দের। আমরা একলব্যের মতোই তাঁকে শিক্ষক ভাবি। একালের গদ্যই শুধু নয়, এ সময়ের জীবনবোধে জীবনানন্দ প্রভাবিত।"*[৭]

নিজে-বাঙাল সন্তান হওয়ায় বাড়িতে ব্যবহৃত ভাষার সূত্র তাঁর সাহিত্যে ছায়া ফেলেছে। উপরন্তু তিনি যা লক্ষ করেছেন সেই অভিজ্ঞতাগুলো তাঁর সাহিত্যে হুবহু স্থানলাভ করে নিয়েছে। সঙ্গে স্থান করে নিয়েছে বঙ্গ নারীরা যে ভাষায় কথা বলে তার আলাপচারিতা। ভাষার যুগোপযোগী পরিবর্তনও তাঁর সাহিত্যের এক অংশ। নতুন উপমা ব্যবহারও তিনি বহু লেখায় প্রয়োগ করেছেন।

আসলে মানবজীবন বহু বিচিত্র অভিধায় সম্বোধিত। সেই সম্বোধনের সঠিক বৈশিষ্ট্য স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর সাহিত্যে অন্বেষণ করেছেন। প্রতিটি মুহূর্তে মানব ইতিহাসের পালাবদল হয়। পালা বদলের রূপকে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মধ্যে রূপ দেন বহুভাবে। সমগ্র বিশ্বের যে পরিবর্তন, যে প্রতিযোগিতা, যে হিংস্রতা, তা মানুষের জীবন যাত্রাকে পরিবর্তন করে চলেছে প্রতিনিয়ত। সেই জীবনবীক্ষার বহুমাত্রা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাসের বিষয় বিন্যাসে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের বা গল্প রচনার বীজ সম্পর্কে তিনি নিজেই মনে করেন হুবহু বাস্তব নয় বাস্তবের সঙ্গে ভালোবাসা মিশিয়ে গুটিপোকাকে প্রজাপতির রূপ দেওয়ার মধ্যেই আসল কারুকার্য। লেখালেখি সম্পর্কে তিনি মনে করেন—

> *"মানুষ আসলে একটা সুন্দরকে লালন করে। সুন্দরের গায়ে ক্ষত দেখলে মানবসত্ত্বা কাঁদে। যদি পারি বিক্ষত মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওই ভাষাহীন ক্ষতজ্বালাকে বোধগম্য অক্ষর ও বাক্যে অনুবাদ করতে পারি, যদি পারি ওই ক্ষতে শুশ্রুষার প্রলেপ দিতে, তবেই লেখকও নিজেকে ছাড়িয়ে ছড়িয়ে যেতে পারে। নিজের গণ্ডির বাইরে চলে যেতে পারলেই অফুরন্ত জীবন। অঢেল জীবন। অবাক বিস্ময়ে জীবনের ভুলভুলাইয়ার ভেতরে ঢুকে যেতে চেষ্টা করি। এগুলোকেই হয়তো গল্পবলা হয়, উপন্যাস বলা হয়। রহস্যময় মানব-মহিমার খোঁজে জীবনের আগাছা হাতড়ানোর চেষ্টার মধ্যে যে আনন্দ, সেই আনন্দ সংরক্ষণের জন্যই এই লেখাজোখা।'*[৮]

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখার মধ্যে একটা বড়ো অংশজুড়েই জায়গা দখল করে অভিজ্ঞতার ঘনঘটা। আজীবন যা যা তিনি দেখেছেন, ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছেন সে বিষয়গুলিকে কাটাছেঁড়া না করেই উপন্যাস মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন অনেক সময় মাসিক পত্রের চাপে উপন্যাসের আকার ছোট হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করলে দেখা যাবে কয়েকটি উপন্যাস বাদ দিলে তাঁর অন্যান্য উপন্যাস মধ্যে কোথাও তথ্যবিহীন অংশ পাওয়া যায় না। তিনি নিজে বাঙাল, ফলে পরিবারের যন্ত্রণার কথাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তথাকথিত বাঙাল পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণে তাঁর নিজস্ব পারিবারিক নোয়াখালির ডায়ালেক্ট তিনি তাঁর

গল্প-উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন প্রসঙ্গক্রমে। অনেক হারিয়ে যাওয়া কথ্যরীতিকে তিনি তাঁর রচনায় জাগিয়ে তুলেছেন বহু প্রসঙ্গে। কর্মসূত্রে বহু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ও বহু জায়গায় গিয়ে অভিজ্ঞতার ফল তাঁর রচনায় ব্যবহৃত ভাষাজ্ঞানের মধ্যে পরিচয় মেলে। যে ভাষা ব্যবহারে অনেকেই দ্বিধাবোধ করেন সেখানে দাঁড়িয়ে স্বপ্নময় চক্রবর্তী অবলীলায় ব্যবহার করেছেন সে সব শব্দ।

কলম আর মনের যুগলবন্দী তো সব লেখকরই থাকে। কিন্তু পারস্পরিক সব ঘটনাকে মনের ঘরে স্থান দিয়ে তা কলমের কারসাজিতে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। নতুন কিছুকে সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি মানুষের আলো-অন্ধকারকে উন্মোচন করেন। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর তথ্য সংগ্রহের ঘটনাকে সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন—

> *"তার আরও একটা অভ্যাস খুব কৌতূহলী করে তুলত আমাকে। রাস্তায়, স্টেশন-চত্বরে, হাটেবাজারে— যখন যেখানে কোনও হ্যান্ডবিল বা চটি বই কিনতে পেত, তা সংগ্রহ করে পরম সমাদরে রাখত নিজের কাছে। এগুলো কোনটা কী গল্প হবে তা আন্দাজ করতেই পারতাম না, কিছুকাল পরে সেই একরত্তি উপকরণ ব্যবহার করে এক-একটা দারুণ গল্প লিখে তাক লাগিয়ে দিত পাঠককে।"*[৯]

এই অভিজ্ঞতার ছায়া তাঁর গল্পসংকলন ও উপন্যাসের পাতায় পাতায় লক্ষ করা যায়।

৫

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ঔপন্যাসিক সত্তার ভিন্নতর মাত্রা নির্মাণে তিনি মূলত বিষয় বিন্যাসে নতুনতর মাত্রা যোগ করেছেন। উপন্যাস পাঠে আমরা বুঝতে পেরেছি তাঁর অন্বিষ্ঠ বিচিত্র মানুষ। যে মানুষের দিকে অনেক সময় সবার বিশেষ নজর পড়ে বা যার দিকে কারুরই নজর পড়ে না সে সব চরিত্র নিয়ে তিনি উপন্যাস সৃষ্টি করেন। সর্বদা জিজ্ঞাসু মন নিয়ে জীবন অতিবাহিত করা স্বপ্নময় চক্রবর্তী সমাজের গভীরে গিয়ে তার রোগ নির্ণয়ে যেমন পারদর্শী তেমনি রোগের কারণ নির্মাণেও। উপন্যাসের দেহ নির্মাণে বিশেষ কোনো রীতির প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব নেই। তবে নতুন ঢঙ তিনি বরাবরই আমদানি করেছেন। আসলে উপন্যাসের রচনা বৈচিত্র্যে নতুন ভাবনার আগমন লেখকদের নব-ভাবনায়, নব-নির্মিতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। স্বপ্নময় চক্রবর্তী আখ্যানের রূপকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নেন। কাহিনি সজ্জায় বা চরিত্র নির্মাণে তিনি কাহিনি রচনার পারম্পর্যকে

বর্জন করেন। তাঁর উপন্যাসে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে স্মৃতিকথার অনুষঙ্গ, আত্মজীবনী রচনার প্রবণতা। ফলে চরিত্রেরা বারবার বর্তমান সময় থেকে নেপথ্যেচারণ করেছে। ফলে গল্প শোনানোর পারম্পর্য রক্ষা করার প্রবণতা তাঁর উপন্যাসে লক্ষ করা যায় না। বা অধ্যায় বিভাজনের ক্ষেত্রে কোনো বাঁধাধরা নিয়মকে তিনি অনুসরণ করেননি। আসলে তিনি সময়বীক্ষাকে অনুসরণ করতে চেয়েছেন। ফলে উপন্যাসের পাঠে উঠে এসেছে নব-নির্মিতি। উপন্যাস নির্মাণে তাঁর ভাষা বা সংলাপ ব্যবহারের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। কারণ, এটিও তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়বাহী। প্রথম উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী' থেকে শুরু করে 'কিছু একটা হয়ে যাবে' পর্যন্ত উপন্যাসের গতিপথে তিনি উপন্যাসের প্রয়োজনে ভাষার বৈচিত্র্যকে সংযোজন করেছেন। প্রথম উপন্যাসে আনঙ্গমোহন ভট্টাচার্যের মুখের ভাষায় তিনি বাঙাল ভাষার ব্যবহার করেছেন চরিত্রের নির্মাণ বৈশিষ্ট্যের কারণে। অন্যান্য চরিত্রগুলির ক্ষেত্রেও তাই। ভাষা নিয়ে বাঙাল ও ঘটির দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত তিনি এই উপন্যাসের মধ্যে রেখেছেন। 'বাস্তুকথা', 'পরবাসী', 'শেকড় ছেঁড়া' উপন্যাসের মধ্যে চরিত্র নির্মাণে বাঙাল ভাষার ব্যবহার করেছেন। 'নবম পর্ব' উপন্যাসে ওড়িষ্যার পটভূমি উঠে আসায় সেখানকার কিছু শব্দের সঙ্গে ঔপন্যাসিক আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। যা উপন্যাসের জীবন্ত হয়ে ওঠাকে প্রমাণ করে—

> *"ইলিশি, তুমি গতবছর জেলা রেকর্ড করেছিলে, এবছর খারাপ করলে কেন?*
> *মাথা নিচু করে ইলিশি বলল, কহি হবনি।*
> *মানে বলা যাবে না।*
> *— কহি হবনি, নাকি কহি পারিবিনি ... বলা যাবে না নাকি বলতে পারবে না?*
> *শ্রীধর জিজ্ঞাসা করল।*
> *— কহি হবনি।*
> *— কাঁহিকি কহি হবনি?*
> *— মু জানে না।'"*[১০]

ভাষা ব্যবহারে স্বপ্নময় চক্রবর্তী 'অবন্তীনগর' উপন্যাসে অভিনবত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সত্যচাঁদের বক্তব্য প্রকাশে তিনি সাধুরীতির গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। সত্যচাঁদের বক্তব্য ডায়ারিধর্মী স্মৃতিকথা ঢঙে লেখা। তার মধ্য দিয়ে হারিয়ে যাওয়া যুগকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যখন লেখার ভাষায় সাধুরীতিকে মান্যতা দেওয়া হত। ফলে তিনি এই উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়কে সাধুভাষায় রচনা করেছেন। অন্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে চরিত্রের মুখের ভাষা সময়-স্থানভেদে পার্থক্যকে চিহ্নিত করেছে। 'দুনিয়াদারি' উপন্যাসের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ মুসলমান সমাজের জীবন-চর্যা

এই উপন্যাসটির কেন্দ্রবিন্দু। ফলে আরবি-ফার্সি কিছু শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন চরিত্রের মধ্যে জীবন আরোপের ক্ষেত্রে। যা উপন্যাসটিকে আলাদা মাত্রা দান করেছেন। 'নাটাদা' উপন্যাসের পটভূমিতে মস্তানদের ব্যবহৃত ভাষাকে ব্যবহার করে উপন্যাসকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রেও স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ভাবনার পরিবর্তন লক্ষ করা যায় 'কম্পিউটার গেম্‌স' উপন্যাস থেকেই। দীর্ঘবাক্য ব্যবহার এই উপন্যাসে তিনি পরিহার করলেন। যুগ মানসিকতার প্রতিফলনে একুশ শতক থেকেই সাহিত্যিকদের অপেক্ষাকৃত ছোট বাক্য ব্যবহার করতে দেখা যায়। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'ভেজাবারুদ', 'কথাবলা পুতুল', 'কিছু একটা হয়ে যাবে' উপন্যাসগুলি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'কিছু একটা হয়ে যাবে' উপন্যাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাক —

> *"কিছুদিন আগে এক মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ এসেছিল। গেরুয়া। ট্রাউজার গেরুয়া শার্ট, একটা আয়ুর্বেদ কোম্পানি থেকে এসেছে, বলল। সচিত্র ফোল্ডার। যার নাম লিটারেচার। বের করল। সেও গো-মূত্ দেখিয়েছিল। হ্যাঁ উচ্চারণটা এরকমই। তয়ে হসন্ত। একটা বড়ির কথাও লেখা ছিল— পুত্রজীবন বীজ। ওটা খেলে পুরুষ সন্তান হবে। সুধি তৈল। যুধিষ্ঠিরের মতো ধীশক্তি হবে।'"*[১১]

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাস রচনার শুরুতে অধিকাংশ উপন্যাসে বিবৃতিধর্মীতাকে আশ্রয় করেছেন। 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসের শুরুটা তিনি সংলাপের মধ্য দিয়ে করেছিলেন বটে। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসে সে ভাবনা থেকে বেরিয়ে এলেন। তবে উপন্যাস মধ্যে ফ্ল্যাশব্যাক রীতিকে তিনি যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ উপন্যাসে তিনি এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মূল কাহিনির সঙ্গে উপকাহিনির সংযোজন ঘটিয়েছেন। তবে উপকাহিনি নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট অনিহা দেখা গিয়েছে। মূল কাহিনিকে গঠন করতে যে উপকাহিনিগুলি বড় ভূমিকা নিতে পারত সেগুলিকে অচিরেই ধ্বংস করেছেন ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। এখানেই তাঁর উপন্যাসের বিশেষত্ব ফুটে ওঠে। যুগের প্রয়োজনে সাহিত্যে তথ্য পরিবেশিত হওয়ার প্রবণতাকে লক্ষ করা যায়। স্বপ্নময় চক্রবর্তী সে বিষয়ে সমকালীন লেখকদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। বাস্তব উদাহরণকে তিনি সংবাদপত্রে পরিবেশিত হওয়ার মতোই উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। ফলে বাদ যায়নি তাঁর সংগৃহীত কথকতা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনের রূপগুলি। তবে গল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তীর এই প্রবণতা যতটা ছিল ঔপন্যাসিক সত্তায় তার কিছুটা কমে এলেও বাদ যায়নি। যার ফলে গল্পের মতো তাঁর উপন্যাসও লাভ করে বিশেষ কাহিনি অবয়ব। 'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ' উপন্যাসেও রয়েছে ছড়া সংগ্রহের উদাহরণ—

"আশ্বিন যায় কার্তিক আসে

মা লক্ষ্মী গভ্‌ভে বসে

গভ্‌ভে বসে সাধ খাও গো,

বর দাও, বর দাও, ধান দাও ...।"[১২]

স্বপ্নময় চক্রবর্তী ক্ষেত্রসমীক্ষা করেন তাঁর লেখার বিষয়কে আরো গভীরতা দান করার সূত্রে। সংগ্রহ করেন বহু তথ্য। সাহিত্যের পাতায় প্রয়োজন বশে সেগুলোর ব্যবহার করেন। 'দুনিয়াদারি' উপন্যাসের মধ্যেও তার প্রমাণ রয়েছে। গরুর হাটে গরু কেনা-বেচার মাঝে কবিগান গাওয়ার চিত্র উঠে এসেছে। গ্রামীণ সংস্কৃতিতে কবিগানের রূপ যে বর্তমান সময়েও রয়েছে তা স্পষ্ট হয়—

"ওগো আল্লা হরি কী যে করি জানি না সাঁতার ঘোর

কলিতে চেয়ে দেখি সবই অন্ধকার কেবল ধান্দাবাজি।

কেবল ধান্দাবাজি হয় না রাজি ধর্মপথে মন

স্বার্থলোভে হইয়া থাকে লোকে সর্বক্ষণ।

খালি ঠগাঠগি

খালি ঠগাঠগি পাপের ভাগী ধর্মকর্ম নাই

গায়ের জোরে কথা বলে কলিকালে ভাই।

ছেলের মস্তানি চুল

ছেলের মস্তানি চুল গোলাপফুল হাতে মোবাইল ফোন

কানের ভিতর ছিপি আঁটা এটাই ফেশন।

আইলা কী জমানা ..."[১৩]

পশ্চিমবাংলায় ছড়িয়া থাকা বহু ছড়া স্বপ্নময় চক্রবর্তী সংগ্রহ করেছেন। ১৯৭২ সালের ভোটের ছড়ার উল্লেখ তিনি 'পরবাসী' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন—

১. *"চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে*

কদম তলায় কে!

প্রমোদ নাচে কেষ্ট নাচে—

জ্যোতি বসুর বে।"[১৪]

২. *ঠিক বলেছিস ঠিক বলেছিস*

ঠিক বলেছিস ভাই

১১ই মার্চে ইন্দিরাকে

সাজিয়ে আনা চাই।''[১৫]

'কান্তকবি', 'নাটাদা', 'কথাবলা পুতুল' উপন্যাসের মধ্যে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী সংগৃহীত বহু ছড়াকে উপস্থাপন করেছেন প্রয়োজনের তাগিদে। আসলে তিনি লোকসংস্কৃতির বিষয়গুলিকে অনুধাবন করেছেন কাছ থেকে। সেগুলোই রূপ পেয়েছে উপন্যাসে, গল্পে। মানুষের জীবন-চর্যায় ছড়া, লোকগান কীভাবে জড়িয়ে থাকে তার চিত্র 'নাটাদা' উপন্যাসে পাঁচি মাসির গানে উঠে এসেছে। গানটি বেদেনি সমাজের নারীদের কাছ থেকে কোনো এক সময় শুনেছিল পাঁচি মাসি। শিশু খেঁদিকে নিয়ে খেলা করার সময় সে গানটি পাঁচি মাসির মুখে শোনা যায়। যা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যবহ—

"র-সে-র বি-নো-দি-য়ে

ভালো নাচবি খেঁদি

মরদ গেছে ধান কাটিতে

সতীনে ধান ভানিতে

চুলোচুলি করে

রসের বি নো দিয়ে

ভালো নাচবি খেঁদি

কী শাক রাঁধিলে খেঁদি

পাট শাকের ঝোল

খাঁদা নাকের ঘড়ঘড়ানি

পাড়ায় গণ্ডগোল

রসের বিনো দিয়ে

ভালো নাচবি খেঁদি''[১৬]

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাসে শুধুমাত্র লোকজ উপাদান ব্যবহারেই চমক দিয়েছেন তা নয়। তিনি বাক্য ব্যবহার এবং শব্দ চয়নেও অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পাত্রের মুখের ভাষার প্রেক্ষিতে তিনি হিন্দি, আরবি-ফার্সি, ইংরেজি এবং উপভাষার ব্যবহার করে সমকাল ও চরিত্রকে জীবন্ত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচন, প্লট নির্মাণ, ভাষা বা সংলাপের ব্যবহার,

লোকজ উপাদান প্রয়োগ সমস্ত দিকেই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ভাষ্য আলাদা মাত্রা পায়। ফলে স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণে সময়োপযোগী রূপকে নির্বাচন করে উপন্যাসকে অনেক বেশি জীবন্ত করে তুলেছেন। আর এখানেই তিনি সমকালের কাছে এবং পরবর্তী সময়ের কাছে অনেক বেশি সমাদরের দাবীদার হয়ে ওঠেন। এভাবেই ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী সমকালের প্রেক্ষিতে পাঠকের কাছে স্বতন্ত্র্য সত্তার দাবি রাখেন।

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী গল্পকার সত্তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। এরপর যে নতুন ভাবমূর্তি ধারণ করেছিলেন সেখানে তাঁর প্রথম বৈশিষ্ট্য শব্দ ব্যবহারের নির্ভিকতা। বাংলা উপন্যাসে নতুন বিষয় এবং প্লট নির্মাণে অভিনবত্ব অনেকেই দেখিয়েছেন। স্বপ্নময় চক্রবর্তী কী দেখাল ? তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন শব্দ চয়নের অভিনবত্ব। স্মার্ট ভাবে যৌনতা কেন্দ্রিক শব্দকে তুলে ধরলেন। যার প্রমাণ তিনি 'অবন্তীনগর' উপন্যাসে শুরু করলেন এবং বৃহৎ আকারে 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে রূপ দিলেন। মানব চরিত্রের গোপন ক্রিয়া-কলাপ, গোপন অঙ্গের বিবরণ, গোপন সম্পর্কের অলিগলিকে তিনি নির্ভিক ভাবে লিপিবদ্ধ করলেন। এই নির্ভিকতা একমাত্র স্বপ্নময় চক্রবর্তীর দ্বারাই সম্ভব। কারণ তিনি মানুষের ভিন্ন জীবন-চর্চার অনুসন্ধানকারী। ফলে মানব চরিত্রের প্রতিটি স্তর তিনি জানতে চান। যার ফলে উঠে আসে তথাকথিত সমস্ত সভ্য-অসভ্যের বা শ্লীল-অশ্লীলের উর্ধ্বে মানব জীবন। মানবজীবনের ইতিহাস-ভূগোল নয়, মানব জীবনের রস-পরিণতিই সাহিত্যের অন্বিষ্ট। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কাছে মানুষের বিচিত্র-জীবন যাত্রার চিত্র আকর্ষণকারী হয়ে ওঠে। সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ব। সাহিত্যের পাতায় তিনি যে তথ্য পরিবেশন করেন তা অনেক সময় সত্য ঘটনার হুবহু প্রয়োগ হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষের অর্ন্ততম রূপের কী পরিবর্তন ঘটল তা পর্যবেক্ষণ করা। অর্থাৎ সাহিত্য যে মানুষের বিচিত্র রূপের, বিচিত্র জীবন জিজ্ঞাসার বিশ্লেষণ করবে তা স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাস রচনায় দেখিয়ে দিয়েছেন। আসলে সাহিত্য আমাদের সমাজের দর্পণ বলেই মানব-চরিত্রের শুধু সামনের দিকটি নয়, যে দিকে আলো পৌঁছোয় না সে দিকটিতে আলোকপাত করে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস সাহিত্যের মূল অন্বিষ্ট মান বজীবনের সমগ্র চালচিত্র। ফলে তাঁর উদ্দেশ্য এবং স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট করা যায় শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরীর একটি বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে—

> *"সাহিত্যের সহিত জীবনের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। ... । সংক্ষেপে কথাটা বলিব। মানুষ সাহিত্যে তাহার ব্যক্তিগত জীবনের সব দিকেরই— তা সে যেদিকই হউক না কেন— বিবরণ চাহিয়াছে। এই চাওয়া হইতেই সাহিত্যের সৃষ্টি। কিন্তু*

এই চাওয়ার ফলে সাহিত্য যাহা দিল, তাহা মানবজীবনের দৈনন্দিন ও সাধারণ অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়, উহার উপরে এবং অতিরিক্ত অনেক কিছু। তাহার ফলে সাহিত্যের ভিতর দিয়া মানুষের দৈনন্দিন ও ব্যক্তিগত জীবনের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিল তাহাতে অনুভূতি আরও গভীর, আদর্শ ও কর্ম আরও অনেক উচ্চ, সুখ-দুঃখ আরও অর্থপূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়।''[১৭]

মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য অন্বেষণকারী স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর লেখনী শক্তির গুণে পাঠকের সামনে আরও অন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে আগামীদিনে উপস্থিত হবেন— এ বিষয়ে আশা রাখা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. 'উপন্যাস নিয়ে', দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রাকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯১, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১৪৩।

২. 'হলদে গোলাপ', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, ষষ্ঠ সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃ. ৩৫৭।

৩. 'কথাবলা পুতুল', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অভিযান পাবলিশার্স, ১০/২এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৪২।

৪. 'অবন্তীনগর', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, সুবর্ণরেখা, জানুয়ারি ২০০২, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯,পৃ. ১৪।

৫. 'চলো দুবাই', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৩।

৬. 'কথাবলা পুতুল', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অভিযান পাবলিশার্স, ১০/২এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৪৬-৪৭।

৭. 'জীবনানন্দ জীবনে যেভাবে জাগেন', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, 'আলাপ বিলাপ', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, পো: দেশবন্ধুনগর ইএ১/৮ বাগুইআটি, খালধার কলকাতা-৫৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২০৫।

৮. 'আমার কথা', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কালের কষ্ঠিপাথর (পত্রিকা), অমরেন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদক), স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রা:লি:, ২৯/১এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৭ জুলাই ২০১২, পৃ. ৬২।

৯. ‘স্বপ্নময়কে নিয়ে দু-চার কথা’, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, পথ সাহিত্য পত্রিকা, মনোরঞ্জন সরদার (সম্পাদক), উকিল পাড়া, পঞ্চাননতলা রোড, বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪, পৃ. ২০।

১০. ‘নবম পর্ব’, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে’জ পাবলিশিং, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ৯৪-৯৫।

১১. ‘কিছু একটা হয়ে যাবে’, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অভিযান পাবলিশার্স, ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৭৬-৭৭।

১২. ‘পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ’, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩২।

১৩. ‘দুনিয়াদারি’, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ১৫-১৬।

১৪. ‘পরবাসী’, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ৯৮।

১৫. তদেব, পৃ. ৯৮।

১৬. ‘নাটাদা’, ‘আরও পাঁচটি উপন্যাস’, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০, দে’জ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৭, পৃ. ১৭০-১৭১।

১৭. ‘প্রেম-সাহিত্য ও জীবনে’, ‘বাঙালী জীবনে রমণী’, শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৭৪, ঊনবিংশ মুদ্রণ, পৌষ ১৪১৮, পৃ. ১৯৯-২০০।